অযোধ্যার বেগম

প্রথম খণ্ড

উল্লঙ্ঘন।

প্রথম অধ্যায়।

হরিদ্বার।

নাদের সাহার ভারত আক্রমণের পরেই দিন দিন মোগল সম্রাটদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইতে লাগিল। সমগ্র ভারতবর্ষ ঘোর অরাজকতা পরিপূর্ণ হইল; এবং সেই সার্ব্বভৌমিক অরাজকতার সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দিল্লীর বাদসাহের আর রাজ্যশাসন করিবার ক্ষমতা রহিল না। কেমনেইবা থাকিবে? শুদ্ধ কেবল পাশববল প্রয়োগ দ্বারা কি কেহ কখন রাজ্যশাসন কিম্বা রাজ্যরক্ষা করিতে পারে? জ্ঞাতসারেই হউক, কি অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রজাপুঞ্জই রাজাকে রাজ্যশাসনের ভার প্রদান করেন। রাজা প্রজা-সাধারণের নিকট হইতে রাজ্যশাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ্য-শাসন করেন; তাহাদিগের ন্যাসধারিস্বরূপ তাহাদিগের ধনসম্পত্তির উপর অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। প্রজা হইতে রাজা স্বীয় নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হয়েন। রাজা প্রজাসমষ্টির ভৃত্য। সুতরাং প্রজারঞ্জন ভিন্ন কেহ রাজপদ রক্ষা করিতে পারেন না।

ভারত-প্রজাগণের এখন আর মোগল সম্রাটদিগের প্রতি [illegible] বিশ্বাস নাই। প্রজাগণ মোগলদিগের প্রতি বীতানুরাগ [illegible]। সুতরাং [illegible] অবশ্যম্ভাবী নিয়মানুসারে মোগল-সাম্রাজ্য যে [illegible] বিলয় প্রাপ্ত হইবে তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

তিন শত বৎসর [illegible]

সুকোমল হস্তে রাজ্যশাসন ক্ষমতা সঞ্চালন করিতেন, অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন, সুতরাং প্রজাগণ তাঁহার উপর অনায়াসে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু এখন আর দিল্লীতে আকবর নাই। এখন আক্‌বরের পরিবর্ত্তে অর্থগৃধ্নু, নীচাশয় কামাসক্ত নরপিশাচগণ শিরে রাজমুকুট ধারণ করিতেছে। ইহারা জন সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। ইহাদিগের নিষ্ঠুরাচরণ রাজবিপ্লবের সময় সমুপস্থিত করিয়াছে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় সুবাদার এবং সৈন্যাধ্যক্ষগণ দিল্লীর অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আপন আপন প্রদেশে স্বাধীনতার ধ্বজা উত্তোলন করিতেছেন।

বঙ্গদেশে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ, বারাণসীতে রাজা বলবন্ত সিংহ, অযোধ্যায় নবাব সবদর জঙ্গ, রোহিলখণ্ডে আলি মহম্মদ; হাইদ্রাবাদে নিজাম, মহিশূরে হায়দর আলি ইহারা প্রত্যেকেই আপনাদিগকে স্বাধীন রাজা বলিয়া মনে করেন; দিল্লীর অধীনতা কার্য্যতঃ কেহই স্বীকার করেন না।

কিন্তু এই সকল স্বাধীনতা প্রয়াসী সুবাদার এবং সৈন্যাধ্যক্ষদিগের কার্য্যকলাপের মধ্যে কেবল রাজ্যবৃদ্ধির প্রয়াসই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বলব্ধ রাজ্য কিরূপে রক্ষা করিবেন তদ্বিষয়ে তাঁহারা কোন চিন্তা করিতেন না। এই হীনবুদ্ধি সুবাদার এবং নবাবগণ বুঝিতেন না যে রাজ্যলাভ অপেক্ষা রাজ্য রক্ষা করাই সমধিক কষ্টকর ব্যাপার।

এ সংসারে দুরাশাই মনুষ্যের বিনাশের কারণ; উচ্চাভিলাষই মানুষকে সময়ে সময়ে বিপদের দিকে পরিচালন করে। ভারতবর্ষের প্রাগুক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় সুবাদার সৈন্যাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান লোক দিল্লীর সম্রাটের বিনাশকাল সমুপস্থিত দেখিয়া শুদ্ধ কেবল আপন আপন রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রায় প্রত্যেকেই আপন প্রতিবেশীর রাজ্য আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ কখনও মুসলমানদিগের রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন, কখনও বা আপনাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অযোধ্যার নবাব স্বীয় প্রতিবেশী রোহিলাদিগের রাজ্যহরণ করিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন; আবার রোহিলাধিপতি আলি মহম্মদ দুর্ব্বল প্রতিবেশীদিগের রাজ্য অপহরণ পূর্ব্বক রোহিলখণ্ডের আয়তন বৃদ্ধি করিলেন। মহিশূরের হায়দর আলি

নিজামের সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের উপর সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নিজাম স্বীয় রাজ্যের নিকটস্থিত বেরার প্রদেশ করতলস্থ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হইলেন। ঈদৃশ অবস্থানিবন্ধন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ এক মহাশ্মশান ক্ষেত্র হইয়া পড়িল। সমগ্র ভারতবর্ষ যেন ভূত প্রেত পিশাচে পরিপূর্ণ হইল। সর্ব্বত্রই সংগ্রামানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আপন রাজ্যরক্ষণে অসমর্থ পররাজ্য লোলুপ এই সকল সুবাদার, রাজা এবং নবাব চরমে প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় পূর্ব্বাধিকৃত রাজ্যও হারাইলেন। সকলেরই এক প্রকার অবস্থা হইল। রাজ্য বৃদ্ধির তৃষ্ণা সকলকেই বিনষ্ট করিল।

দেশের স্থানে স্থানে এইরূপ সংগ্রামানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে প্রজাসাধারণের ঘোর কষ্ট যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। প্রজাগণ সর্ব্বদাই এই সংগ্রামানল সম্ভূত দাবাগ্নিতে দগ্ধীভূত হয়। সংসারে আর তাঁহাদের কোন সুখ শান্তি থাকে না।

কিন্তু মানব প্রকৃতি বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কষ্ট যন্ত্রণার নাম শুনিয়াই মানুষ ত্রাসিত হয়। কষ্ট যন্ত্রণার আশঙ্কাই কেবল মানুষকে কথঞ্চিৎ কষ্ট প্রদান করে। কিন্তু যখন কষ্ট যন্ত্রণা সমুপস্থিত হয় তখন সে কষ্ট তত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় না, সে যন্ত্রণা তত দুঃখ প্রদান করিতে পারে না। এ সংসার যতই কষ্ট যন্ত্রণার স্থান হউক না কেন মনুষ্য সকল প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা, সকল প্রকার দুরবস্থার সহিত আপন প্রকৃতির সামঞ্জস্য সংস্থাপনে সমর্থ।

এখন শতবর্ষ পরে আমরা মনে করি অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতা নিবন্ধন আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিয়া ছিলেন; জীবন তাঁহাদিগের নিকট অসহনীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল; হয়তো তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা কেবল মৃত্যুকামনা করিতেন।

কিন্তু এটী আমাদের স্পষ্ট ভ্রম। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই সংগ্রামানলের মধ্যে অবস্থান করিয়াও আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ আমাদিগের ন্যায়ই স্বচ্ছন্দে আহার বিহার হাস্য পরিহাসে দিনাতিপাত করিতেন। দেশ যেরূপ দুরবস্থাপন্ন হউক না কেন, জন-সাধারণ তজ্জন্য কোন দিনও ভ্রূক্ষেপ করে না। সকল অবস্থাতেই তাহারা একভাবে হাঁটে চলে খায়। তবে যখন

একেবারে নিজের উপর কোন বিপদ আসিয়া পড়ে তখন কিছু কালের নিমিত্ত কষ্টানুভব করিতে থাকে।

কিন্তু সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই সকল দেশে এবং সকল যুগে এক একটী দেশের কোটী কোটী লোকের মধ্যে এমন দুই একটী লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা সংসারের উপর সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট থাকেন। সংসারের সঙ্গে যেন ইঁহাদিগের চির বিবাদ রহিয়াছে। এসংসারে ইঁহারা পাপ তাপ দুঃখ কষ্ট অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পারেন না। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সংসারের সেই পাপ, তাপ, দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচারের সঙ্গে আজীবন সংগ্রাম করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিবার পর ভাবী বংশাবলীর নিকট দেশ সংস্কারক, কিম্বা সমাজ সংস্কারক, অথবা ধর্ম্ম সংস্কারক বলিয়া পরিচিত হয়েন। আর কেহ কেহ সংসারের সঙ্গে একেবারে সংশ্রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাণপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করেন, নির্জ্জনে একাকী অরণ্যে বাস করেন। সংসারের লোকের সঙ্গে তাহাদিগের কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সংসার বিরাগী যে দুই চারিটী লোক ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই দেশ-সংস্কারক কিম্বা ধর্ম্ম সংস্কারকের পথাবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা সংসারের সঙ্গে সর্ব্ব প্রকার সম্বন্ধ পরিহার পূর্ব্বক নির্জ্জন অরণ্যে কিম্বা পর্ব্বতে বাস করিতেন, সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। হিমাচলের নিকটবর্ত্তী সুরম্য অরণ্যই তাঁহাদিগের একমাত্র আবাস ভূমি ছিল। ইঁহারা শুদ্ধ কেবল শান্তি লাভাশায় সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতেন। হরিদ্বার প্রভৃতি হিমাচলের নিকটবর্ত্তী তীর্থ স্থানে ভ্রমণ করিতেন।

হিমাচলের মূল প্রদেশের যে স্থান হইতে বেগবতী পবিত্র সলিলা গঙ্গা সমুত্থিত হইয়া ক্রমে পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানটী প্রাচীন কাল হইতেই হরিদ্বার নামে পরিচিত। প্রাচীন লোকেরা হরিদ্বারকে ভগবান কমলাপতির আবাসস্থান বৈকুণ্ঠের দ্বার বলিয়া মনে করিতেন। এই স্থানটী যেরূপ সুরম্য তাহাতে হরিদ্বার বৈকুণ্ঠের দ্বার বলিয়া পুরাতন কবিদিগের সহজেই সংস্কার হইতে পারে।

বিবিধ তরুরাজি পরিশোভিত হরিদ্বারের উপত্যকা প্রকৃতি দেবীর বিহার উদ্যান বলিয়া মনে হয়। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রাচীন

আর্য্যদিগের হৃদয় কবিত্ব রসে পরিপূর্ণ করিত। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখানে গঙ্গার পার্শ্বে বসিয়া মহর্ষিগণ নানা ছন্দে সামবেদ গান করিতেন। সুতরাং হরিদ্বার এখন পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত রহিয়াছে। সাধু মহাত্মাগণ সর্ব্বদাই এইস্থানে বসিয়া যোগ সাধন করিয়া থাকেন।

১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, একদিন অপরাহ্নে একটী লোক হরিদ্বারের একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর বসিয়া নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করিতে ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড রহিয়াছে। তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু নিপতিত হইতেছে। ইঁহার বয়ঃক্রম ষাট বৎসরের যে অধিক হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শরীরে এখনও বিলক্ষণ তেজ আছে। সমুদয় শরীর ভস্মাবৃত। পরিধান একখান কৌপীন। সময়ে সময়ে ইঁহার মুখ হইতে দুই একটী কথা বহির্গত হইতেছে। কিন্তু সে কি কথা তাহা নিকটে না দাঁড়াইলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। অনেকক্ষণ পরে তিনি একবার বলিয়া উঠিলেন—

"হা পরমেশ্বর! এজীবন বৃথা গেল।"

কিছু কাল আবার নির্ব্বাক্ থাকিয়া বলিলেন—

"শাস্ত্রাধ্যয়ন কেবল অভিমান উৎপাদন করে। শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও মানুষ আপনাকে চিনিতে পারে না।"

আবার নিমীলিত নেত্রে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"মানুষমাত্রেই ঈশ্বরের সেনা। এ সংসারের প্রত্যেককেই সৈনিক পুরুষ হইতে হইবে। ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি বিবর্জ্জিত হইয়া বৃথা জীবন যাপন করিতেছি।"

"বৃথা জীবন যাপন করিতেছি" এই কথা বলিবামাত্র পশ্চাৎ হইতে অকস্মাৎ একজন লোক বলিয়া উঠিল—

"বৃথা জীবন বলিয়াই তো যাহাতে পৃথিবী লোকশূন্য হয় তাহারই উপায় দেখিতেছি।

প্রথমোক্ত ব্যক্তির কর্ণে এই নবাগত দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা প্রবেশ করিল না। তিনি নিমীলিত নেত্রে নিজের চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। [illegible] লোকের মুখ হইতে যদ্রূপ কথা বাহির হয়, সেই প্রকার ইঁহার মুখ হইতে উপরিউক্ত বাক্য সকল বাহির হইতেছিল।

এই দ্বিতীয় লোকটী গঙ্গার অপর পার হইতে নদীর উপর দিয়া হাঁটিয়া আসিয়াছেন। গঙ্গায় বড় অধিক জল ছিল না। পারে উঠিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তি যে পাহাড়ে বসিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই পাহাড়ে উঠিয়াছিলেন। এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে "বৃথা জীবন যাপন করিতেছি" এই কথা বলিতে শুনিয়া পশ্চাৎ হইতে বিকট হাস্য করিয়া "বৃথা জীবন বলিয়াই তো যাহাতে পৃথিবী লোক শূন্য হয় তাহারই উপায় দেখিতেছি", এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই নবাগত লোকটীর শরীর একেবারে অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া পড়িয়াছে। এ ব্যক্তিকে হাঁটিতে দেখিলে বোধ হয় যেন বায়ুর দ্বারা ইহার সমুদয় শরীর সঞ্চালিত হইতেছে। ইহার আকৃতি মানুষের ন্যায় হইলেও ইহাকে মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, মানুষের ছায়ার ন্যায় বোধ হয়। যাহারা ভূত প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাহারা ইহাকে দেখিবামাত্র নিশ্চয়ই অপদেবতা বলিয়া অবধারণ করিবেন। ক্রমে এই ব্যক্তি প্রথমোক্ত ধ্যানশীল লোকটীর নিকট আসিয়া আবার বিকট হাস্য করিয়া বলিল—

"ঠাকুর আবার কি চিন্তা করিতেছ? এবার বড় শুভ সংবাদ। যে যুদ্ধ বাধিয়াছে হয় তো এবার আমাদের বঙ্গদেশেও সংগ্রামানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে"।

প্রথমোক্ত ব্যক্তির ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া একদৃষ্টে এই দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার বলিল "ঠাকুর কি ভাবিতেছ? আমার কথাটা বুঝি এখনও তোমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই? বড় শুভ সংবাদ। তুমুল সংগ্রাম হইবে। এ যুদ্ধেও পৃথিবী লোক শূন্য হইবে না?"

প্রথমোক্ত ব্যক্তি এখনও অবাক্ হইয়া এক দৃষ্টে দ্বিতীয় লোকটীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। কিছুকাল পরে অতি মৃদুস্বরে আপনা আপনি বলিলেন—

"হা পরমেশ্বর! শোক দুঃখ প্রভৃতি সাংসারিক অবস্থার নিকট মানুষ চিরকালই পরাজিত। জ্ঞানলাভ, শাস্ত্রাধ্যয়ন কিছুই মানুষকে দুঃখ দারিদ্রের বিষময় ফল হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিতে পারে না।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ঠাকুর তোমার ও সাংসারিক অবস্থার কথা অনেক

শুনিয়াছি। আমি নিজেও বাল্যকালে অনেক বিষয় অধ্যয়ন করিয়া ছিলাম। আমি বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য।—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সর্ব্বত্র আমি পরিচিত ছিলাম। এখন আমার আসল কথা শোন।

এই দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য, আর প্রথমোক্ত ধ্যানশীল মহাপুরুষের নাম পণ্ডিত শ্রীনিবাস। বাণেশ্বরের জন্মস্থান বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিক্রমপুর। ইনি রাজা রাজবল্লভের গুরুবংশোদ্ভব। আর শ্রীনিবাস একজন সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত। প্রায় সাত আট বৎসর হইল কলিকাতায় ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। পরে শ্রীনিবাস বাণেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আনিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস বাণেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন কোথা হইতে আসিলে।"

বাণেশ্বর। সে কথা পরে বলিব। একটা শুভ সংবাদ আছে তাই আগে শোন।

শ্রীনিবাস। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কি শুভ সংবাদ।

বাণেশ্বর। বড় যুদ্ধ বাধিয়াছে। যদি মহারাষ্ট্রীয়গণ এ যুদ্ধে রোহিলাদিগের পক্ষাবলম্বন করেন, তবে শতবর্ষেও এ সংগ্রামানল নির্ব্বাপিত হইবে না। এই যুদ্ধ উপলক্ষেই আমার আশা পূর্ণ হইবে। নিশ্চয়ই এবার পৃথিবী লোক শূন্য হইবে।

শ্রীনিবাস। হা হতভাগ্য, এখনও তোমার স্কন্ধে সেই ভূত রহিয়াছে। এত দীর্ঘকাল নানা দেশ এবং নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়াও মনের সাম্যাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হইলে না। বৃথা শাস্ত্রাধ্যয়ন! সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাই মানব জীবন গঠন করিতেছে।

বাণেশ্বর। ঠাকুর আবার যদি তুমি "সামাজিক অবস্থা "মানব জীবন" ও সকল পণ্ডিতি কথা বল তবে আমি এখনই চলিয়া যাইব। মহারাষ্ট্রীয়গণ এই যুদ্ধে কোন পক্ষাবলম্বন করিবেন কি না তাই বল।

শ্রীনিবাস। তাহা আমি কিরূপে বলিব? তুমি কি মহারাষ্ট্রীয় প্রদেশেও গিয়া ছিলে?

বাণেশ্বর। আমি কি ঠাকুর আর তোমার ন্যায় একস্থানে বসিয়া থাকি? কখনও মহারাষ্ট্রীয় প্রদেশে, কখনও মহিশূরে, কখনও হাইদ্রাবাদে, কখনও দিল্লীতে, কখনও অযোধ্যায়—এইরূপে নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছি।

শ্রীনিবাস। কি উদ্দেশ্যে এ পর্য্যটন? শরীরটা একেবারে ক্ষয় করিয়াছ।

বাণেশ্বর। আর কি উদ্দেশ্য আছে। যেখানেই যাই সেই দেশীয় রাজপুরুষদিগকে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করি। তাহাদিগকে বলিয়া থাকি বাছা! যুদ্ধ কর নিশ্চয়ই তোমার রাজ্য বৃদ্ধি হইবে। তাহারা তখন আমার কথা শুনিয়া হাস্য করে। আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করে। কিন্তু অবশেষে আবার আমার উপদেশানুসারেই কার্য্য করে। এই বার, তের বৎসরের মধ্যে স্থানে স্থানে কত যুদ্ধ হইল দেখিতেছ না?

শ্রীনিবাস। তুমি কি মনে কর যে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজগণ তোমার উপদেশানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন?

বাণেশ্বর। আমার উপদেশানুসারেই হউক কি অন্য কোন কারণেই হউক তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমার উদ্দেশ্য সাধন হইলেই হয়। পৃথিবী মনুষ্য শূন্য হইলেই আমার আশা পূর্ণ হয়।

শ্রীনিবাস। পৃথিবী মনুষ্য শূন্য হইলে তোমার কি লাভ হইবে?

বাণেশ্বর। তাহা হইলেই সংসারের সকলের দুঃখ কষ্ট একেবারে দূর হইবে। এক জন মরিবে আর একজন বাঁচিয়া থাকিবে সে ভাল নহে। সমস্ত পৃথিবী একেবারে বিনষ্ট হইলেই ভাল। তাহা হইলে কাহারও মনে কোন দুঃখ থাকে না।

শ্রীনিবাস। সমস্ত পৃথিবীর লোক কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছে, যে তুমি তাহাদিগের অমঙ্গল কামনা করিতেছ?

বাণেশ্বর। মানুষের ন্যায় হিংস্র জন্তু তো আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঘ ভালুক কোন জন্তুই মানুষের ন্যায় এত নিষ্ঠুর নহে। সর্পের মধ্যেও কৃতজ্ঞতা থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষের মধ্যে তাহাও নাই।

শ্রীনিবাস। (ঈষৎ হাস্য) মানুষ তাহার ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি সংরক্ষণ করিতে পারিলে দেবজীবন লাভ করিতে পারে। বর্ত্তমান সমাজ প্রচলিত পাপ এবং কুসংস্কারই জনসাধারণকে এইরূপ জঘন্য করিয়া তুলিয়াছে।

বাণেশ্বর। মানুষ দেবতা হইতে পারে একথা অনেক দিন হইতে শুনিতেছি। কিন্তু একটা মানুষকেও দেবতা হইতে দেখা গেল না। আমি এখন নিশ্চয় বুঝিয়াছি মানুষের ন্যায় বদ্‌জানওয়ার আর নাই।

ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু অপেক্ষা মানুষ শতগুণে নিষ্ঠুর। তাই আমি ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজগণ মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দিয়া, পৃথিবী মনুষ্য শূন্য করিবার চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীনিবাস। তুমি একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছ। এই যে রাজগণ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, ইহারা কি তোমার উপদেশানুসারে যুদ্ধ করে? কেন তুমি দেশে দেশে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছ? তুমি কিছু কাল আমার নিকট থাক, আমি তোমার স্কন্ধের ভূত ছাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

বাণেশ্বর। আমি একক্রমে এক দণ্ড সময়ও একস্থানে তিষ্ঠিতে পারি না। দুই চারি মুহূর্ত্ত একস্থানে বসিলেই মন চঞ্চল হইয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ আবার স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা হয়। এই জন্যই লোকে বলে যে আমার স্কন্ধে ভূত চাপিয়াছে।

শ্রীনিবাস। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে তোমাকে ভূতে পাইয়াছে। ভূত আর কিছুই নহে। মানুষ যখন কোন একটা বিশেষ মানসিক ভাব দ্বারাই কেবল পরিচালিত হয়, অন্য আর কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে না, তখনই তাহাকে ভূতে পায়। পৃথিবী লোক শূন্য হউক, এই চিন্তাই তোমার অন্তর অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অন্য কোন বিষয়ে কি অন্য কোন কথায় তুমি মনোযোগ প্রদান করিতে পার না। একস্থানে এক দণ্ড বসিয়া বিশ্রাম করিতে পার না। সুতরাং লোকে মনে করে যে তোমাকে ভূতে পাইয়াছে।

বাণেশ্বর। তবে ঠাকুর এখন বিদায় হই। আর অধিকক্ষণ বসিতে পারি না।

শ্রীনিবাস। আর একটু অপেক্ষা কর। আর দুই একটা কথা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিব।

বাণেশ্বর। যাহা হয় ঠাকুর শীঘ্র শীঘ্র বল। আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না।

শ্রীনিবাস। এখন কোথায় যাইবে?

বাণেশ্বর। রোহিল খণ্ডে।

শ্রীনিবাস। রোহিল খণ্ডে কি প্রয়োজন?

বাণেশ্বর। সেখানেইতো যুদ্ধ হইবে।

শ্রীনিবাস। কাহার সঙ্গে রোহিলাদের যুদ্ধ হইবে?

বাণেশ্বর। উজীর সুজাউদ্দৌলা এবং ইংরাজগণ এক পক্ষ। আর রোহিলাগণ অপর পক্ষ।

বাণেশ্বরের এই কথা শুনিয়া শ্রীনিবাস অত্যন্ত আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিলেন—"হা পরমেশ্বর দেশের কি দুরবস্থাই হইল। একটা নবাব কি রাজা আপন রাজ্য সুশাসন করিবার চেষ্টা করে না, বা প্রজার দুঃখ নিবারণ করিতে যত্ন করে না। সকলেই কেবল পর রাজ্য অপহরণের চেষ্টা করিতেছে। ইহাদিগের প্রত্যেককেই চরমে আপন আপন কর্ত্তব্য উল্লঙ্ঘনের বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে। ইহাদের কাহারও রাজ্যপদ চিরস্থায়ী হইবে না।"

শ্রীনিবাসের বাক্যাবসানে বাণেশ্বর বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন—

"কি ঠাকুর এখনতো আমার মতেই আসিতে হইল। আমি তো পূর্ব্ব হইতেই বলিতেছি যে মানুষ বড় পাজি জানোয়ার। এমন বদ্ জানোয়ার আর কোথাও নাই। এক একটা নবাব কিম্বা এক একটা রাজার ঘরে তাহার দুই তিন শত পত্নী রহিয়াছে। কিন্তু তত্রাচ সুযোগ পাইলে পরস্ত্রী হরণ করিতে ত্রুটী করে না। এক একটা নবাব কিম্বা রাজার ঘরে কোটি কোটি টাকা রহিয়াছে, তাঁহার সুবিস্তীর্ণ রাজ্য রহিয়াছে। কিন্তু তত্রাচ পররাজ্য এবং পরধন অপহরণ করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে না। অন্যান্য কোন হিংস্র জন্তু এইরূপ করে না। ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু আপন আপন অভাব মোচনার্থ, আপন উদর নিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত জীব হত্যা করে। ব্যাঘ্র যখন একটা জীবহত্যা করিয়া তাহার মৃত শরীর সম্মুখে লইয়া বসে তখন আর অপর কোন জীব জন্তুকে আক্রমণ করে না। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন না থাকিলেও সে অনায়াসে দশটা নরহত্যা করিতে পারে। শাস্ত্রে যাহাই লিখিত থাকুক না কেন, মানুষ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুর জন্তু তাহার কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীনিবাস ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"হায় অবস্থানুসারে তাহাই হইয়া পড়িয়াছে!"

বাণেশ্বর। তাহা না হইলে এ দুর্দ্দশা কিরূপে হইল?

শ্রীনিবাস। ভাই নিজের দুরবস্থার নিমিত্ত অপরকে কখন দোষ দিবে না। তোমার আমার দুরবস্থা আমাদের কর্ত্তব্য উল্লঙ্ঘনের অবশ্যম্ভাবী ফল।

এ সংসারে কর্ত্তব্য উল্লঙ্ঘন না করিলে, ন্যায় ও সত্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট না হইলে, কাহাকেও কখনও কোন দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

বাণেশ্বর। ঠাকুর ও সকল কর্ত্তব্যের কথা শুনিতে আমার ইচ্ছা হয় না। এখন চলিলাম। আর তিষ্ঠিতে পারি না। (বিকট হাস্য করিয়া) কাঁধের ভূত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীনিবাস। রোহিলখণ্ডে যাইয়া তোমার কি লাভ হইবে?

বাণেশ্বর। এযুদ্ধে কত জন লোক বিনষ্ট হয় তাহার একটা হিসাব রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে আর ঠিক করিতে পারি না যে কত বৎসরে পৃথিবী লোক শূন্য হইবে। এদিকে আমারও পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। কাঁধে এই ভূত আছে বলিয়া এখনও হাটিতে চলিতে পারি। কিন্তু এ ভূত না থাকিলে একেবারেই চলৎশক্তি হীন হইয়া পড়িতাম।

শ্রীনিবাস। তোমার শরীর যে একবারে [illegible] হইয়াছে, তাহা যে তুমি নিজে বুঝিতে পার তাহাই আমি মনে করিতামনা।

বাণেশ্বর। (বিকট হাস্য করিয়া) ঠাকুর আমি সকলই বুঝিতে পারি। আমি বাণেশ্বর তর্কপঞ্চানন। ন্যায়, দর্শন, সকল শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন—

এই বলিয়াই বুকে করাঘাত পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"হা পুত্র কন্যা স্ত্রী, এ বুকের মধ্যে সর্ব্বদা আগুণ জ্বলিতেছে।"

ইহার পর বাণেশ্বর উঠিয়া দ্রুতপদ সঞ্চারে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। এবং তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—

"তুমি গমনোন্মুখ হইলে তোমাকে কেহ বাঁধিয়াও রাখিতে পারে না। কিন্তু আমার একটী অনুরোধ রাখিবে।"

বাণেশ্বর। কি অনুরোধ?

শ্রীনিবাস। দুই একমাসের মধ্যে আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবে।

"রোহিলা যুদ্ধ শেষ হইলেই তোমার এই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিব" এই বলিয়া বাণেশ্বর দুই চারি মিনিটের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রোহিলখণ্ড।

অযোধ্যা এবং কমাউন পর্ব্বতের মধ্যস্থিত গঙ্গানদীর পূর্ব্ব পার্শ্ববর্ত্তি যে সুবিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড পূর্ব্বে কুতাহার নামে পরিচিত ছিল তাহাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে রোহিলাশ্রেষ্ঠ আলি মহম্মদের প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে রোহি-লখণ্ড নামে অভিহিত হইল। রোহিলখণ্ড অযোধ্যার সংলগ্ন রাজ্য। উজীর সবদরজঙ্গের সময় হইতেই অযোধ্যার নবাবদিগের রোহিলখণ্ড অধিকার করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু সংগ্রাম প্রিয় রোহিলাদিগকে পরাস্ত করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং এ পর্য্যন্ত উজীর নির্ব্বাক ছিলেন।

এই উপন্যাসের উল্লিখিত ঘটনার সময় সবদর জঙ্গের পুত্র উজীর সুজা-উদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব ছিলেন। উজীর কামেরউদ্দিনের মৃত্যুর পর অযোধ্যার নবাব সবদরজঙ্গ দিল্লীর বাদসাহের উজীরের পদে নিযুক্ত হই-য়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার সময় হইতে অযোধ্যার নবাবগণ পুরুষপরম্প-রায় উজীর উপাধি ধারণ করিতেন।

উজির সুজাউদ্দৌলা রোহিলখণ্ড স্বীয় রাজ্য ভুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজদিগের সাহয্যাপ্রার্থী হইলেন। ইংরাজগণ অর্থলোভে তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। ১৭৭৪ সালের প্রারম্ভে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল চাম্পীয়ন সসৈন্যে অযোধ্যায় আসিয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে অশীতিবর্ষবয়স্ক রোহিলাশ্রেষ্ঠ হাফেজরহমতখাঁ স্বদেশ রক্ষার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবার রোহিলাদিগের ঘোর বিপদাশঙ্কা রহিয়াছে। অযোধ্যার সুবাদারের সমুদয় সৈন্য ইংরাজ-সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবে। এই সম্মিলিত সৈন্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ ইতিপূর্ব্বে রোহিলাদিগের পরস্পরের মধ্যে একটু গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছিল বলিয়া উপযুক্ত সময় থাকিতে সৈন্য সংগ্রহ করা হয় নাই। গৃহবিচ্ছেদই রাজ্যবিনাশের একমাত্র মূল কারণ। আবার জনবিশেষের একাধিপত্যের ইচ্ছাই সর্ব্বদা গৃহ বিচ্ছেদ আনয়ন করে।

যে কারণে রোহিলাদিগের মধ্যে গৃহ বিচ্ছেদ হইয়াছিল, এবং যে পাপে রোহিলা রাজ্য বিনষ্ট হইল, তৎসমুদয় সংক্ষেপে এই স্থানে বিবৃত নাকরিলে এই উপন্যাসে উল্লিখিত ঘটনা পাঠকগণ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। অতএব এই অধ্যায়ে সেই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

১৬৭৩ খৃষ্টীয় অব্দে সাহ আলম এবং হোসন খাঁ নামক দুই ভ্রাতা কুতাহারে (অর্থাৎ বর্ত্তমান রোহিলখণ্ড) বাস করিতেন। ইঁহারা আফগান দেশীয় লোক ছিলেন। সময়ে সময়ে ইঁহারা দুই ভাই মোগল সম্রাটদিগের অধীনে সৈনিক পুরুষের কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাহ আলমের দুই পুত্র ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দাউদখাঁ। কনিষ্ঠের নাম হাফেজ রহমত খাঁ। দাউদ খাঁ কামাউনের রাজার সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় প্রভুর অনেক উপকার সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রভু তাঁহাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন না। সুতরাং তিনি পদ পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। রাজা তাঁহার পদত্যাগের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহার হস্ত পদ কর্ত্তন করিলেন। দাউদখাঁর প্রাণ বিনষ্ট হইল। দাউদ খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আলি মহম্মদ পিতার ন্যায় সংগ্রামপ্রিয় ছিলেন। তিনি একদিন না একদিন পিতৃবৈর নির্যাতন করিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন।

পিতৃ বিয়োগের পর আলি মহম্মদ মোরাদাবাদের ফৌজদার আজমত্ উল্লা খাঁর অধীনে এক জন সৈনিক পুরুষের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু আজমত্উল্লার পদচ্যুতির পর আলিমহম্মদ অল্প সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোরাদাবাদের নিকটবর্ত্তী সমুদয় ভূমি অধিকার করিলেন। ক্রমে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি দিন দিন আপন অধিকারও বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

মোরাদাবাদের নিকট দিল্লীর বাদসাহের মীর বক্সী (Paymaster General) উমদাৎ মূলকের অনেক জায়গীর ছিল। উমদাৎমূলক লোক পরম্পরায় শ্রবণ করিলেন যে আলিমহম্মদ তাঁহার জায়গীরের অন্তর্গত কতক ভূমি অধিকার করিয়াছেন। তিনি তখন আলিমহম্মদকে দণ্ড প্রদান করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে একজন সেনাপতিকে মোরাদাবাদে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার প্রেরিত সেনাপতি মোরাদাবাদে পৌঁছিয়া

আলি মহম্মদের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। আলিমহম্মদ যুদ্ধ করিয়া সসৈন্যে সেনাপতিকে একেবারে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

আপন প্রেরিত সেনাপতির মৃত্যু সংবাদে উমদাৎ মূলক যারপরনাই কোপাবিষ্ট হইয়া রাজবিদ্রোহীস্বরূপ আলি মহম্মদকে দণ্ড বিধান করিবার নিমিত্ত দিল্লীর বাদসাহকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দিল্লীর বাদসাহের কর্ম্মচারিগণের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ শত্রুতা ছিল। প্রত্যেকেই প্রত্যে-ককে হিংসা করিতেন, প্রত্যেকেই অপরের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করি-তেন। বাদসাহের উজীর কামিরউদ্দীন আলিমহম্মদকে ধৃত করিবার নিমিত্ত বাদসাহকে সৈন্য প্রেরণ করিতে উদ্যত দেখিয়া অতি বিনীত ভাবে বাদসাহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ধর্ম্মাবতার এই গোলামের একটা কথা শুনিয়া যাহা হয় করুন। আলিমহম্মদ মন্দ লোক নহেন। মীর বক্‌সী উম্‌দাত মূলকের প্রেরিত সেনাপতি তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছিল। তাহাতে সে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়াছে। ন্যায়া-নুসারে ইহাতে সে দণ্ডার্হ হইতে পারে না।"

বাদসাহ উজীরের কথা শুনিয়া আর সৈন্য প্রেরণ করিলেন না। এদিকে আলি মহম্মদ মীরবক্সী উম্‌দাত মূলকের সমুদয় জায়গীর অধিকার করি-লেন।

ইহার পর সায়দউদ্দীন নামক একজন রাজবিদ্রোহীকে ধৃত করিবার নিমিত্ত দিল্লীর বাদসাহ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। উজীর কামিরউদ্দীন আলি মহম্মদকে বাদসাহের প্রেরিত সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া এই রাজ-বিদ্রোহীকে ধৃত করিবার নিমিত্ত লিখিলেন।

আলিমহম্মদ এই পত্র পাইয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত বাদসাহের প্রেরিত সৈন্যের সঙ্গে, মিলিত হইয়া সায়দউদ্দীনকে ধৃত করিলেন। বাদ-সাহ আলি মহম্মদের রাজ ভক্তি দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নবাব উপাধি প্রদান করিলেন, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অনেক ভূমিও দান করিলেন।

কিন্তু দিন দিন আলি মহম্মদের ক্ষমতা ও যশঃ বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া, উজীর কামির উদ্দীনের মনে মনে আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। তিনি তখন আপন বিশ্বাসী লোক রাজা হরানন্দকে মোরাদাবাদের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন, এবং তাঁহাকে আলি মহম্মদের কার্য্যকলাপ সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলিলেন।

রাজা হরানন্দ মোরাদাবাদে পৌঁছিয়াই আলিমহম্মদের নিকট দিল্লীর বাদসাহের প্রাপ্য রাজস্ব তলপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রমে ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। অবশেষে আলিমহম্মদ সংগ্রামে হরানন্দকে পরাস্ত করিলেন। এই যুদ্ধে হরানন্দের প্রাণ বিয়োগ হইল।

রাজা হরানন্দ উজীর কামিরউদ্দীনের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন এবং অনতিবিলম্বে স্বীয় পুত্র মীর মনুকে সৈন্য সামন্ত সহ আলি মহম্মদকে ধৃত করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন।

মীর মনু সৈন্য সামন্ত সহ মোরাদাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু সহসা আলিমহম্মদকে আক্রমণ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। আলি মহম্মদও তাঁহাকে সহসা আক্রমণ করিলেন না। উভয় পক্ষের সৈন্য পরস্পর হইতে কিছুদূরে অবস্থান করিতে লাগিল। অবশেষে আলিমহম্মদের যত্নে উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। আলিমহম্মদ বিবিধ যৌতুক সহ নিজের একটি কন্যাকে উজীর কামিরউদ্দীনের এক পুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন।

উজীর কামিরউদ্দীনের সহিত আলিমহম্মদের এই প্রকার আত্মীয়তা হইলে পর তাঁহার ক্ষমতা এবং অধিকার আরও দৃঢ়ীভূত হইল। আলিমহম্মদ আফগান প্রদেশের রোহিলা সম্প্রদায়স্থ লোক। সুতরাং এখন তিনি তাঁহার এই নব উপার্জ্জিত রাজ্য রোহিলখণ্ড নামে অভিহিত করিলেন, এবং রোহিলখণ্ডের নবাব বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রোহিলখণ্ডে আলিমহম্মদের রাজত্ব দৃঢ়ীভূত হইবার পর তিনি পিতৃবৈরী কমাউনের রাজাকে দণ্ড বিধান করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে কমাউন প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সপরিবারে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। আলিমহম্মদ বিনা যুদ্ধে রাজার প্রাসাদে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজার ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিলেন।

কমাউন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আলিমহম্মদের সৈন্যদিগের সহিত অযোধ্যার নবাব সবদরজঙ্গের লোকের বিবাদ হইল। সবদর জঙ্গের লোকেরা কমাউনের নিকটবর্ত্তী স্থানে শাল বৃক্ষ কর্ত্তন করিতেছিল। ইহাদিগের সহিত বিবাদ হইলে আলি মহম্মদের লোকেরা ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ইহাদিগের সংগৃহীত সমুদয় শাল বৃক্ষ আত্মসাৎ করিল।

নবাব সবদর জঙ্গ আলি মহম্মদের এই অন্যায় ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া দিল্লীর বাদসাহের নিকট অভিযোগ করিলেন, এবং রাজবিদ্রোহী স্বরূপ আলিমহম্মদের প্রাণ দণ্ড করিবার নিমিত্ত বাদসাহকে অনুরোধ করিলেন। সবদর জঙ্গের প্রতি বাদসাহের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। তিনি সবদরের অনুরোধে আলি মহম্মদের প্রাণদণ্ড করিবার অভিপ্রায়ে সবদরকে সঙ্গে করিয়া সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। উজীর কামির উদ্দীন এবার আর আলি মহম্মদকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না।

কিন্তু আলি মহম্মদ অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে দিল্লীর বাদসাহ এবং অযোধ্যার নবাব একত্রে উভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভের আশা নাই। সুতরাং তিনি ইহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন না। দিল্লীর বাদসাহের শরণাগত হইলেন। বাদসাহ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ইহার প্রাণবিনাশের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু বন্দীস্বরূপ ইহাকে দিল্লীতে লইয়া গেলেন।

সবদরজঙ্গ মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে বাদসাহ আলি মহম্মদের প্রাণ বিনাশ করিলেই রোহিলখণ্ড তিনি অধিকার করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা বিফল হইল।

বাদসাহ আলি মহম্মদকে ধৃত করিবার পর রোহিলখণ্ডের নিকট গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বে অনেক সৈন্য রাখিয়া গেলেন। রোহিলা সৈন্যগণ গঙ্গাপার হইয়া আলিমহম্মদের উদ্ধারার্থ দিল্লীতে না যাইতে পারে, এই অভিপ্রায়েই সৈন্যগণ গঙ্গার পার্শ্বে ছাউনি করিয়া রহিল। কিন্তু আলি মহম্মদের প্রতি রোহিলা সৈন্যদিগের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। তাহারা অনেকদূর দক্ষিণে সরিয়া যাইয়া গঙ্গা পার হইল; এবং আলি মহম্মদের উদ্ধারার্থ দিল্লীতে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজ প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী কোন এক উদ্যানে রাত্রি অবস্থান করিল। পর দিন প্রাতে রাজপ্রাসাদের দ্বারে যাইয়া বলিল, যে আলি মহম্মদকে কারামুক্ত করিয়া না দিলে তাহারা রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করিবে।

ইহাদিগের ঈদৃশ বীরত্ব দর্শনে উজীর কামিরউদ্দীন এবং স্বয়ং বাদসাহ অত্যন্ত ভীত হইলেন। অনেক বাদানুবাদের পর ইহাদিগের সহিত এই রূপ বন্দোবস্ত হইল, যে আলি মহম্মদ স্বীয় পুত্র কায়েজউল্লা খাঁ এবং আব-দুল্লাখাঁকে প্রতিভূ স্বরূপ দিল্লীতে রাখিলে কারামুক্ত হইতে পারিবেন।

কিন্তু কারামুক্ত হইলেও তিনি সম্প্রতি রোহিলখণ্ডে যাইতে পারিবেন না। বাদসাহের অধীনে সারহিন্দের রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিবেন। উভয় পক্ষই ইহাতে সম্মত হইলেন। আলি মহম্মদ স্বীয়পুত্র ফায়েজুল্লা খাঁ এবং অবদুল্লাকে দিল্লীতে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া সারহিন্দে গমন করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ রোহিলখণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আলি মহম্মদ সারহিন্দে পৌঁছিবার কিছুকাল পরেই অর্থাৎ ১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দে আহম্মদ সা আবদালি কর্ত্তৃক দেশ আক্রান্ত হইল। উজীর কামের উদ্দীন স্বীয় পুত্র মীরমনু এবং আলিমহম্মদের পুত্র ফায়েজ উল্লা এবং আবদুল্লাকে সঙ্গে করিয়া আবদালির সঙ্গে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত লাহোর যাত্রা করিলেন। লাহোরে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরে অকস্মাৎ কামির উদ্দীনের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্রগণ এবং ফায়েজ উল্লা প্রভৃতি এই মৃত্যু ঘটনা গোপন করিয়া আবদালির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এক ক্রমে তিনবার আবদালি পরাস্ত হইল। কিন্তু শেষ বারে আবদালির জয় লাভ হইল। তখন মীর মনু এবং আলি মহম্মদ প্রভৃতি আবদালিকে অনেক ধন রত্ন দিয়া এই দেশ ছাড়িয়া যাইতে সম্মত করাইলেন। আবদালি অসংখ্য অসংখ্য ধন রত্ন এবং আলি মহম্মদের পুত্র আবদুল্লা ও ফায়েজউল্লাকে প্রতিভূ স্বরূপ সঙ্গে লইয়া কান্দাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে আলি মহম্মদ সারহিন্দ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রাজ্য রোহিলখণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রম নিবন্ধন তাঁহার শরীর রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি আপন মৃত্যু নিকট অনুভব করিয়া স্বীয় বাহুবলে উপার্জ্জিত রাজ্য কিরূপে রক্ষা হইবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আলি মহম্মদের যে কেবল সংগ্রামে পারদর্শিতা ছিল তাহা নহে। রাজনীতি সম্বন্ধেও তিনি বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

তিনি মনে করিলেন যে তাঁহার পুত্রগণের হস্তে রাজ্য শাসনের সমুদয় ভার অর্পণ করিলে তাহাদের অদূরদর্শিতা নিবন্ধন রাজ্যের অন্যান্য প্রধান লোক রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে। কিম্বা রাজ্যের প্রধান লোকের কোন এক পুত্রের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক অপর পুত্রদিগের সঙ্গে বিবাদ ঘটাইয়া

দিতে পারে। অতএব ভবিষ্যতে ঈদৃশ কোন দুর্ঘটনা না ঘটিতে পারে সেই অভিপ্রায়ে তিনি এক প্রকার প্রতিনিধি তন্ত্র (Represntative Government) সংস্থাপনের অভিপ্রায় করিলেন। রাজ্যের প্রত্যেক প্রধান প্রধান লোক এবং সৈন্যাধ্যক্ষের হাতে রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় একটা না একটা কার্য্যের ভার অর্পণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি মনে করিলেন, যে, রাজ্যের প্রত্যেক লোকের হাতে শাসন সম্বন্ধীয় একটা না একটা কার্য্যের ভার থাকিলে রাজবিপ্লব হইবার কোন সম্ভব হইবে না। যদি ইহাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ হিংসার ভাব উপস্থিত হয়, তবে একজন অপরের পদলাভ করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু সমূলে রাজ্য নষ্ট করিবার চেষ্টা কেহই করিবে না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, আপন পুত্রদিগের মধ্যে সমুদয় রাজ্য বিভাগ করিলেন। তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে আবদুল্লা এবং ফায়েজউল্লা প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এখনও কান্দাহারে প্রতিভূ স্বরূপ অবস্থান করিতেছেন। সাদুল্লা খাঁ, মহম্মদ ইয়ার খাঁ, মুর্ত্তজ খাঁ, এবং আল্লা ইয়ার খাঁ, ইহারা চারিজন নাবালগ। আলি মহম্মদ স্বীয় পিতৃব্য হাফেজ রহমত খাঁকে এই চারি নাবালগ পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত করিলেন, এবং মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে দেশের সমুদয় প্রধান প্রধান লোককে ডাকাইয়া আনিয়া, প্রত্যেকের হস্তে রাজ্য শাসনের একটা না একটা ভার প্রদান করিলেন।

হাফেজ রহমত খাঁর সঙ্গে একত্রে দুন্দিখাঁকেও পুত্রদিগের অভিভাবক স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন এবং এতদ্ভিন্ন সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্যের ভারও তাহারই হস্তে অর্পণ করিলেন। নিয়ামত খাঁ এবং শিলাবৎ খাঁর হস্তে আয় ব্যয় পর্য্যবেক্ষণের ভার এবং ফতেখাঁর হস্তে গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিলেন। সবদর খাঁকে বক্সীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু এই বন্দোবস্ত অনুসারে হাফেজ রহমত খাঁই সর্ব্বপ্রধান রাজপ্রতিনিধির পদ প্রাপ্ত হইলেন। হাফেজ ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দেশের সকলেই তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন।

আলিমহম্মদের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিত রোহিলখণ্ড পরিশাসিত হইতে লাগিল। প্রজাগণ পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। কৃষি বাণিজ্যাদিরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইল।

কিন্তু জন বিশেষের স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, এবং একাধিপত্য

করিবার ইচ্ছা সর্ব্বদাই সংসারে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আনয়ন করিতেছে। মানুষ স্বার্থপরতা বিবর্জ্জিত না হইলে এ সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা কখনও নিরাকৃত হইবে না। হাফেজ রহমত খাঁর স্বার্থপরতাই সুখ শান্তি পরিপূর্ণ রোহিলা রাজ্য বিনাশের বীজ বপন করিল। হাফেজ রহমত খাঁ সময়ে সময়ে অবৈধরূপে শাসন কার্য্য সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। দেশীয় অন্যান্য প্রধান লোক ইহাতে হাফেজের প্রতি ক্রমে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

কয়েক বৎসর পরে আলিমহম্মদের জ্যেষ্ঠপুত্রদ্বয় আবদুল্লাখাঁ এবং ফায়েজউল্লা খাঁ কান্দাহার হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হাফেজ ইহাদিগকেও রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করিলেন না। অধিকন্তু আলিমহম্মদের উইলানুসারে ইহাদিগের প্রাপ্য সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিবার সময় হাফেজ ইহাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের প্রতি পক্ষপাত করিলেন।

হাফেজরহমত খাঁর প্রতি দিন দিন রোহিলাগণের বিশ্বাস ও ভক্তি হ্রাস হইতে লাগিল। সুতরাং হাফেজের অবিমৃষ্যকারিতাই রোহিলাদিগের জাতীয় একতার মূলে কুঠারাঘাত করিল।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ আক্রান্ত হইতেছিল। হাফেজরহমত খাঁ শুনিতে পাইলেন, যে অনতিবিলম্বে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিবেন। এসংবাদ শ্রবণে তিনি অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। আপনাকে অনন্যোপায় মনে করিয়া স্বদেশ রক্ষার্থ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ সন্ধি হইল রোহিলাদেশ মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলা স্বীয় সৈন্য প্রদান করিয়া তাহাদের সাহায্য করিবেন। রোহিলাগণ এই সাহায্যের বিনিময়ে তাঁহাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। এই সন্ধি সংস্থাপনই রোহিলারাজ্য বিনাশের দ্বিতীয় কারণ। শত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিতে হইলে কিম্বা দেশের অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে হইলে দেশীয় লোকের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। বিদেশীয় রাজার সাহায্য গ্রহণ দ্বারা কেবল স্বীয় দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করা হয়।

এই সন্ধি সংস্থাপনের পর মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি রোহিলা প্রদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার রোহিলা প্রদেশে প্রবেশ

করিবার পূর্ব্বেই বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইল। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ গঙ্গা পার হইয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিতে অসমর্থ হইলেন। সুতরাং সে বৎসর তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সুজা উদ্দৌলাকে আর সৈন্য দ্বারা রোহিলাদিগের সাহায্য করিতে হইল না।

কিন্তু সুজা উদ্দৌলা তত্রাচ হাফেজ রহমতের অঙ্গীকৃত চল্লিশ লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। হাফেজ টাকা দিতে একেবারে অস্বীকৃত হইলেন না; সময়ান্তরে টাকা দিবার ভাণ করিয়া কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে রোহিলখণ্ডের অন্যান্য প্রধান প্রধান লোক এই টাকার অংশ দিতে একবারে অস্বীকার করিলেন।

সুজাউদ্দৌলা দুই বৎসরের মধ্যেও তাঁহার দাবীকৃত টাকা পাইলেন না। তখন তিনি মনে মনে দুরভিসন্ধি করিলেন যে রোহিলাগণ তাহাদের অঙ্গীকৃত টাকা প্রদান করিয়া সন্ধির নিয়ম প্রতিপালন করেন নাই বলিয়া তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন; যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের রাজ্য একবারে আত্মসাৎ করিবেন।

সুজাউদ্দৌলা রোহিলারাজ্য অধিকার করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই সচেষ্ট ছিলেন। বর্ত্তমান ঘটনা তাঁহার সেই পূর্ব্বাভিপ্রায় সাধনের উৎকৃষ্ট সুযোগ প্রদান করিল। কিন্তু অপরের সাহায্য ভিন্ন নিজের বাহুবলে তাঁহার রোহিলারাজ্য অধিকার করিবার সাধ্য ছিলনা। সুতরাং তিনি কলিকাতাস্থ ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি ইংরাজদিগের গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে ইংরাজগণ তাঁহাদের সৈন্য প্রেরণ করিয়া রোহিলারাজ্য বিনাশার্থ তাঁহার সাহায্য করিলে তিনি সৈন্যদিগের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাসিক দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা দিবেন; আর যুদ্ধে জয়লাভ হইলে পর পুরস্কার স্বরূপ ইংরাজদিগকে চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন।

ইংরাজগণ স্বভাবতঃ কিছু অর্থ লোভী। তাঁহারা এই পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু অবস্থানুসারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

মাসিক দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা এবং পুরস্কার চল্লিশ লক্ষ—এত অধিক টাকার লোভ সম্বরণ করা অর্থ গৃধ্নু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু এ দিকে আবার রোহিলাগণ ইহা-

দিগের নিকট কখনও কোন অপরাধ করেন নাই। কি ছলনা করিয়া তাহাদিগের বিনাশার্থ সৈন্য প্রেরণ করিবেন, তাহা আর ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কলিকাতা কৌন্সিলে এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হইতে লাগিল। কিন্তু দুই তিন মাসের মধ্যেও ইঁহারা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দস্যুবৃত্তি অবলম্বন ভিন্ন আর এ টাকা গ্রহণ করিবার উপায়ান্তর নাই।

সুজাউদ্দৌলা ইংরাজদিগকে এই বিষয় উত্তর প্রদানে বিলম্ব করিতে দেখিয়া গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেবকে তাঁহার রাজধানীতে আসিতে অনুরোধ করিলেন। ১৭৭৩ সনের আগষ্ট মাসে হেষ্টিংস সুজাউদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন।

বারাণসীতে হেষ্টিংসের সহিত সুজাউদ্দৌলার সাক্ষাৎ হইল। রোহিলাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত হেষ্টিংস সুজাউদ্দৌলাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন*। বারাণসীতে হেষ্টিংস এবং সুজাউদ্দৌলার মধ্যে একখানি সন্ধি পত্র লিখিত হইল। ইতিহাসে এই সন্ধিপত্রখানি বারাণসী-সন্ধিপত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু হেষ্টিংস বড় সুচতুর এবং ধূর্ত্ত লোক ছিলেন। এই বারাণসী-সন্ধি পত্রে রোহিলাযুদ্ধের কথা বিন্দু বিসর্গও উল্লিখিত হইল না। কেবল মাত্র এই কথা লিখিত রহিল যে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা একদল ইংরাজ সৈন্য আপন রাজ্যে রাখিবার প্রার্থনা করিয়াছেন এবং সেই সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক দুইলক্ষ দশ হাজার টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন; অতএব ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির এক দল সৈন্য তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে।

রোহিলা যুদ্ধের কথা কোর্ট অব ডিরেক্টর দিগের নিকট লিখিতেও হেষ্টিংসের সাহস হইল না। কোন সাহসেইবা লিখিবেন? রোহিলাদিগের সহিত ইংরাজদিগের কখনও কোনও বিবাদ নাই। অনর্থক সেই নিরপরাধী লোকদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করা দস্যুতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।

---

* "I found him (says Warren Hastings in his appeal to the Directors dated 3rd December 1774) still equally bent on the design of reducing the Rohillas *which I encouraged*, as I had done before, by dwelling on the advantages which he would derive from its success.

কিন্তু এই বারাণসী-সন্ধিপত্রে আর যে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা এই স্থানে উল্লেখ না করিলে উপন্যাসের পরবর্ত্তী অধ্যায়ের লিখিত বিষয় পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন না। বারাণসী সন্ধিপত্র দ্বারা হেষ্টিংস আলাহাবাদ এবং কোরা এই দুইটি জিলা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যে সুজাউদ্দৌলার নিকট বিক্রয় করিলেন। সুজাউদ্দৌলা বারাণসীর বর্ত্তমান রাজা চৈৎ সিংহের রাজ্য ক্রয় করিবার নিমিত্তও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস এবার চৈৎ সিংহকে তাঁহার পৈত্রিক রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিতে সম্মত হইলেন না। চৈৎ সিংহের রাজ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে যেরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল তাহাই বলবৎ রাখিলেন।

আলাহাবাদ এবং কোরা এই দুইটি জিলাতে চৈৎ সিংহের রাজ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কখনও কোন সত্ত্বাধিকার ছিল না। কিন্তু এখন দেশের প্রকৃত রাজা মোগল সম্রাটদিগের ক্ষমতা একেবারে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। সমুদয় ভারতবর্ষ এখন বেওয়ারেশ মাল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস সমুদয় ভারতবর্ষ বিক্রয় করিলেও তাঁহাকে বাধা দিতে পারে, এমন কোনও লোক তখন এদেশে ছিল না।

দিল্লীর বর্ত্তমান সম্রাট সাহআলম আলাহাবাদ এবং কোরা এই দুই জিলার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। ১৭৬৫ সালে যখন তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বঙ্গ বেহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রদান করেন, তখন আলাহাবাদ-সন্ধিপত্র দ্বারা এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিল, যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বৎসর বৎসর সাহআলমকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান করিবেন আর আলাহাবাদ এবং কোরা এই দুই জিলা হইতে সাহআলমকে কেহ বেদখল করিতে উদ্যত হইলে, ইংরাজেরা সম্রাটের সাহায্য করিবেন।

এই সন্ধিপত্রের পূর্ব্ব হইতে এযাবৎ বরাবর সম্রাট আলাহাবাদ এবং কোরার রাজস্ব ভোগ করিতে ছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্রাটকে তাঁহাদিগের পক্ষাবলম্বন করিতে বাধ্য করিলেন। সম্রাটের নিজের কোন ক্ষমতা নাই, তিনি বাধ্য হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের করতলস্থ হইয়া পড়িলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া আলাহাবাদ কোরা এবং অন্যান্য অনেকানেক প্রদেশের রাজস্ব তাঁহার নিকট হইতে লিখাইয়া লইলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই উপলক্ষে সম্রাটকে আলাহাবাদ এবং কোরা

হইতে বঞ্চিত করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। সম্রাট মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, এই ছলনা করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্রাটের প্রাপ্য বঙ্গ বেহার এবং উড়িষ্যার রাজস্ব ছাব্বিশ লক্ষ টাকা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন এবং আলাহাবাদ এবং কোরা ওয়ারেণ হেষ্টিংস পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যে সুজাউদ্দৌলার নিকট বিক্রয় করিলেন।

হেষ্টিংস এইরূপে সুজাউদ্দৌলার সহিত সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত সম্পন্ন করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এথানে পৌঁছিয়া তিনি রোহিলা-দিগের বিনাশার্থ জেনারেল চ্যাম্পীয়নকে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়া সসৈন্যে তাঁহাকে সুজাউদ্দৌলার নিকট প্রেরণ করিলেন। এবং বিশেষ চাতুরী প্রকাশ পূর্ব্বক কলিকাতা কৌন্সিলের অপরাপর মেম্বরদিগের নিকট বলিলেন, যে সুজাউদ্দৌলার সহিত অনেক বিষয় সম্বন্ধে গোপনে কথাবার্ত্তা চালাইতে হইবে অতএব তাঁহার নিজের এক জন বিশ্বাসী লোক অযোধ্যার রেসিডেন্ট স্বরূপ নিযুক্ত করা আবশ্যক। কৌন্সিলের মেম্বরগণ তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন তিনি মিডল্টন সাহেবকে অযোধ্যার রেসি-ডেন্টের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এই সময় কলিকাতা কৌন্সিলে অপর বার জন মেম্বর ছিলেন। রেগুলেটিং আইন (Regulating Act) অনুসারে জেনেরেল ক্লেবারিং কর্ণেল মন্সন এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রভৃতি যে তিন জন মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা তখন পর্য্যন্তও কলিকাতায় পৌঁছেন নাই। ইঁহারা তখন পৌঁছিলে বোধ হয় হেষ্টিংস রোহিলাদিগের বিনাশার্থ ইংরাজ সৈন্য প্রেরণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

তৃতীয় অধ্যায়।

যুদ্ধ।

সংগ্রামের নাম শ্রবণমাত্রই অনেকের অন্তরে সাধুসুলভ ঘৃণার উদয় হয়। তাঁহাদিগের মতানুসারে শান্তিলাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য; সুতরাং যদ্দ্বারা সংসার অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইতে তাঁহারা মানুষকে সর্ব্বদা বিরত থাকিতে উপদেশ প্রদান করেন।

কিন্তু যুদ্ধ কি সর্ব্বদাই সংসারে অশান্তির বীজ বপন করে? সংগ্রামানল, সমুত্থিত সেই দৃষ্টতঃ অশান্তি হইতে কি কখনও শান্তি সমুৎপন্ন হয় না?

সমরানল সর্ব্বদাই জগতে অশান্তি, দুর্নীতি, অত্যাচার এবং স্বার্থপরতা ভস্মীভূত করিয়া সংসারের নৈতিক বায়ু পরিশুদ্ধ করিতেছে। যদি সময়ে সময়ে এজগতে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত না হইত, তবে মানবমণ্ডলীকে চির-কালই সর্ব্বজন ঘৃণিত সেই রোমীয় সম্রাট নিরো কিম্বা তৎসদৃশ নরপিশাচগণ কর্ত্তৃক নিষ্পেষিত হইতে হইত।

এ সংসার যখনই দুর্নীতি এবং অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয় তখনই সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া তৎসমুদয় ভস্মীভূত করে। সমগ্র মানবমণ্ডলীর স্বাধীনতা রক্ষার্থ, জগতের দাসত্বশৃঙ্খল উন্মোচনার্থ সংসারে যে সকল সংগ্রাম হইয়াছে তদ্দ্বারা মানবমণ্ডলীর উপকার ভিন্ন কখনও কোন অপকার হয় নাই।

অর্থ কিম্বা পদপ্রভুত্বের লোভে যাহারা যুদ্ধ করে; মানবমণ্ডলীর স্বাধীনতা হরণার্থ যাহারা জগতে সংগ্রামানল প্রজ্বলিত করে; তাহারা সত্য সত্যই দস্যু। এইরূপ সংগ্রামের প্রতি স্বভাবতঃই লোকের ঘৃণার উদয় হইতে পারে।

প্রকৃত বীরগণ সংগ্রামক্ষেত্রে ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করেন না। পুরা-কালে ভারতের যোদ্ধাগণ শত্রুকে কখনও অস্ত্রহীনাবস্থায় আক্রমণ করিতেন না। শত্রু শরণাগত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কখনও তাহার উপর অস্ত্রক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু রোহিলা যুদ্ধে দেশীয় এবং বিলাতি বীরগণ পরাজিত এবং পলায়মান শত্রুর স্ত্রী ও কন্যাকে পর্য্যন্ত দণ্ড প্রদান করিতে ক্রটী করেন নাই। ইহারা বীররসে প্রমত্ত হইয়া কি বৃদ্ধা, কি যুবতী, কি বালিকা, কি কুলবধূ, সকলের নিকট স্বীয় স্বীয় রণকৌশলের পরিচয় প্রদান করিলেন। বোধ হয় ইহাদের বীরত্ব কিছু অধিক ছিল। নহিলে সাংগ্রা-মিক তৃষ্ণা এত প্রবল হইবে কেন।

পুরাকালে ভারতবর্ষের প্রকৃত বীরদিগের পরস্পরের মধ্যে যে যে স্থানে সংগ্রাম হইয়াছিল, এখন সেই সকল স্থান পুণ্যক্ষেত্র নামে পরিচিত। সংগ্রামক্ষেত্রে প্রত্যেক যুধ্যমান ব্যক্তি আপন আপন হৃদয়ের স্বার্থপরতা এবং বিষয়াসক্তি পরিহার পূর্ব্বক কেবল অত্যাচার এবং অন্যায় ব্যবহারের অবরোধার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইতেন। তাঁহাদিগের তৎ-সাময়িক মানসিক অবস্থা তাঁহাদিগকে দেবতার পরিণত করিত। সুতরাং সেই দেব সদৃশ যুদ্ধার্থীদিগের সম্মিলন স্থান পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এ সংসারে মানব প্রকৃতির দেবত্ব সংগ্রামক্ষেত্রেই

বিকসিত হয়। সংগ্রামক্ষেত্রে মানুষ আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রকৃত কর্ম্মযোগীর পবিত্র জীবন লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

কিন্তু রোহিলাযুদ্ধের ইতিহাসের মধ্যে কি মানব প্রকৃতির সেই দেবভাব পরিলক্ষিত হয়? নবাব সুজাউদ্দৌলা ইংরাজ সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইংরাজদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনেরেল চ্যাম্পীয়ন অযোধ্যায় পৌঁছিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া রোহিলাগণ ভীত হইল। ইতিপূর্ব্বে তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে গৃহবিচ্ছেদ ছিল, আসন্ন বিপদ দর্শনে তাহা বিস্মৃত হইল। সকলের মধ্যে তখন একতার সঞ্চার হইল। তাহারা সকলেই নবাবের দাবীকৃত চল্লিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া হাফেজ রহমতের হস্তে দিল। হাফেজ নবাবের শরণাগত হইয়া তাঁহার দাবীকৃত টাকা গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা এখন আর টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। টাকার দাবী একটা ছলনা মাত্র। রোহিলাদিগকে বিনাশ করিয়া রোহিলাখণ্ড স্বীয় রাজ্যভুক্ত করাই সুজাউদ্দৌলার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

হাফেজ রহমত খাঁ দেখিলেন, নবাব সুজাউদ্দৌলা কিছুতেই যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইলেন না। তখন তিনি অনেক যত্ন এবং পরিশ্রমে চারি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। আবাল বৃদ্ধ সমুদয় রোহিলা স্বদেশ রক্ষার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইল।

১৭৭৪ অব্দের ১৭ই এপ্রিল হাফেজ রহমত খাঁ এবং ফায়েজ উল্লাখাঁ সসৈন্যে যাত্রা করিয়া, বগানদীর পার্শ্বে কটার গ্রামে সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। ২০শে এপ্রিল ইংরাজদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ সসৈন্যে সাজেহানপুর পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন; কিন্তু ২৩ এপ্রিলের পূর্ব্বে যুদ্ধারম্ভ হইল না।

২৩ শে এপ্রিল উভয় পক্ষের সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিল। হাফেজ রহমত এবং ফায়েজ উল্লা এই যুদ্ধে অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন। রোহিলাদিগের সৈন্য সংখ্যা চারি সহস্রের অধিক নহে, কিন্তু বিপক্ষদিগের সৈন্য সংখ্যা ইহার চতুর্গুণ ছিল। সৈন্য সংখ্যার ন্যূনতা প্রযুক্ত রোহিলাগণ ভগ্নোৎসাহ না হয়, তজ্জন্য হাফেজ রহমত এবং ফায়েজ উল্লা স্বীয় স্বীয় হস্তী পৃষ্ঠ হইতে ভূমে অবতরণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে উভয়েই সমগ্র সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ ইহাঁদিগের বীরত্বে যারপরনাই উৎসাহিত হইল।

এবং কালান্তক যমের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া শত শত ইংরাজ সৈন্যের প্রাণ বিনাশ করিল।

জেনারেল চ্যাম্পীয়ন ইহাদিগের বীরত্ব দর্শনে বিস্মিত এবং চমৎকৃত হইলেন। তিনি তখন মনে মনে ঘোর বিপদাশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু অত্যল্প কাল মধ্যে রোহিলাদিগের বারুদ গোলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শূল যুদ্ধে রোহিলাগণ বিশেষ পারদর্শী ছিল। ইহাদিগের কামান ইত্যাদি যুদ্ধ সামগ্রী বড় অধিক ছিল না। বিশেষতঃ উপযুক্ত সময় থাকিতে যথেষ্ট বারুদ ও গোলা সংগ্রহ করিতে পারে নাই। এদিকে ইংরাজদিগের কামান, যুদ্ধের আয়োজনের কোন ক্রুটি ছিল না।

হাফেজ রহমত খাঁ দেখিলেন ঘোর বিপদ উপস্থিত। তিনি ফায়েজ উল্লার সহিত পরামর্শ করিয়া ইংরাজ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্বে যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার কৌশল করিলেন। এ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের সৈন্য পশ্চিম মুখী হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। রোহিলা সৈন্য পূর্ব্ব মুখ হইয়া রহিয়াছে। হাফেজ রহমত অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যে স্বীয় সৈন্যগণকে দক্ষিণে কিঞ্চিৎ সরাইয়া উত্তর মুখ করিলেন। তখন রোহিলা সৈন্যগণ ইংরাজদিগের বাম পার্শ্ব হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইল। এদিকে বিপক্ষ আর্টিলারী মেন (Artillery-men) পশ্চিম মুখী হইয়া রহিল। এই সুযোগে রোহিলা সৈন্য একবারে ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শূলাঘাতে তাহাদিগের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল। ইংরাজদিগের কামান ব্যবহার করিবার সুবিধা রহিল না।

প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেও জেনারেল চ্যাম্পীয়ন তাঁহার কামানযোদ্ধাগণকে দক্ষিণ মুখী করিতে সমর্থ হইলেন না। ইত্যবসরে হাফেজ রহমত ও ফায়েজউল্লা মত্তহস্তীর ন্যায় ইংরাজ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে দলন করিতে লাগিলেন। হাফেজ রহমত মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, যে ইংরাজ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলে আর তাঁহাদিগের কামান দ্বারা যুদ্ধ করিবার সুযোগ থাকিবে না। সুতরাং তাহারা বাধ্য হইয়া শূল যুদ্ধ আরম্ভ করিবে।

কিন্তু নবাব সুজাউদ্দৌলার কতক সৈন্য কিঞ্চিৎ দূরে ছিল। ইংরাজ সৈন্যদিগকে একবারে পরাস্ত হইতে দেখিয়া তাহারা রোহিলাদিগের

পশ্চাতে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন ফায়েজ উল্লা এবং মহবত খাঁ কতক সৈন্য দক্ষিণ মুখ করিয়া নবাব সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এই অবসরে এদিকে জেনারেল চ্যাম্পীয়ন তাঁহার কামান-যোদ্ধাদিগকে আবার যথোপযুক্ত রূপে দক্ষিণ মুখ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিলেন।

রোহিলাগণ এখনও আল্লা আল্লা বলিয়া দুইদিকের সৈন্য সহ তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিল। রোহিলাযুবক মহবতখাঁ অশ্বারোহণে নবাব সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একাকী অন্যূন দুই শত লোকের শিরশ্ছেদন করিলেন। কিন্তু এদিকে ভয়ানক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। অকস্মাৎ হাফেজ রহমতের বুকের উপর একটা কামানের গোলা আসিয়া পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। সৈন্যাধ্যক্ষের পতন দেখিয়া সৈন্যগণ ভীত হইয়া পড়িল। ফায়েজ উল্লা তদ্দর্শনে আবার সৈন্যগণকে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত আল্লা আল্লা বলিয়া ইংরাজ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হাফেজের এখন পর্য্যন্তও মৃত্যু হয় নাই। তিনি ফায়েজউল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আর আশা নাই সংগ্রাম ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রীলোকের ইজ্জাৎ রক্ষা করিবার চেষ্টা কর।"

এই কথা বলিবার পরই হাফেজের কণ্ঠাবরোধ হইল। ধরাতলশায়ী স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের পার্শ্বে রোহিলাকুলতিলক হাফেজ রহমত খাঁ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ কুরুকুল দেবতা মহাবীর ভীষ্মদেবের ন্যায় শরশয্যায় পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার বক্ষ হইতে অবিশ্রান্ত শোণিত নির্গত হইতে লাগিল।

আলিমহম্মদ্ নন্দন বীর চূড়ামণি ফায়েজউল্লা খাঁ এখনও নিরাশ হয়েন নাই। হাফেজের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আবার আল্লা আল্লা বলিয়া হাফেজের দ্বিতীয় তৃতীয় পুত্র এবং মহবতের সঙ্গে একত্রে শূল হস্তে ইংরাজ সৈন্যদিগের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রায় পঞ্চাশ জন ইংরাজ একত্র হইয়া হাফেজের দ্বিতীয় পুত্রকে ধৃত করিল। এদিকে মহবত খাঁর বক্ষে আসিয়া একটা গোলা পড়িল। তথনও ফায়েজউল্লা সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে আল্লা আল্লা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য সংখ্যা একবারে হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা পশ্চাৎ হইতে মাত্র দুই শত সৈন্য আল্লা আল্লা বলিয়া উঠিল। ফায়েজউল্লা এখন নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার

পার্শ্বস্থিত হাফেজের কনিষ্ঠ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চল এখন যাহাতে স্ত্রীলোকদিগের ইজ্জাৎ থাকে তাহারই চেষ্টা করি।"

এই বলিয়া তিনি প্রথমতঃ আপনপক্ষের ভগ্ন সৈন্যদিগকে পলায়নের পথ করিয়া দিলেন, পরে হাফেজের পুত্রকে সঙ্গে করিয়া অশ্বারোহণে সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন।

ইংরাজ এবং সুজাউদ্দৌলার সৈন্যগণের জয়লাভ হইল। তাহারা তখন উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

রমণীর বীরত্ব।

রোহিলা রমণীগণ জানিতেন যে রোহিলাদিগকে কেহ কখনও যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে না। রোহিলাগণ বিশ্ববিজয়ী এটী তাহাদিগের বদ্ধমূল সংস্কার হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগের প্রত্যেক কথা এবং কার্য্য অন্তরস্থিত প্রগাঢ় জাতীয় গর্ব্ব এবং জাতীয়গৌরব প্রকাশ করিত। ইহারা আপনাদিগকে বীরবালা, বীরপত্নী, বীর জননী বলিয়া জানিতেন।

ইঁহাদিগের স্বামী পুত্র সংগ্রামে চলিয়া গেলে পর ইঁহারা নিঃশঙ্কহৃদয়ে গৃহে বসিয়া আমোদ প্রমোদে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইঁহাদিগের কোন ভাবনা চিন্তা নাই। কেনই বা থাকিবে। ইঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে যে স্বামী পুত্র সংগ্রামে ইংরাজদিগকে পরাস্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বাঙ্গালিরমণীর স্বামী পুত্র এইরূপ যুদ্ধে চলিয়া গেলে তাঁহাদিগের আহার নিদ্রা একেবারে রহিত হইত। তাঁহারা স্বামী পুত্রের বিপদাশঙ্কা মনে করিয়া অহর্নিশ কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও বঙ্গ রমণীর মধ্যে যে একবারে বীরত্ব নাই তাহা আমরা বলিনা। আসল কথা সকলের বীরত্ব একবিধ নহে। রোহিলা রমণীর বীরত্ব যেরূপ বাক্যে এবং কার্য্যে প্রকাশিত হয়, বঙ্গমহিলার বীরত্ব ঠিক সেইরূপ কার্য্যে এবং বাক্যে প্রকাশিত না হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বঙ্গমহিলা-

দিগের যে বিষয়ে বীরত্ব আছে তাহাও কি অস্বীকার করিব? তাহা হইলে আর ন্যায়ানুগত বিচার হইল না।

সকল দেশীয় বীরগণই এক প্রকার অস্ত্রধারণ করেন না বা এক প্রণালীতে যুদ্ধ করেন না। সকলের সংগ্রামক্ষেত্র একরূপ নহে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সময়ে এক এক জন বীর এক এক প্রকার ব্যূহ রচনা করিতেন। রোহিলাগণ শূলযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী; ইংরাজগণ কামান যুদ্ধে সর্ব্বদাই দক্ষতা প্রকাশ করেন।

বঙ্গমহিলার অস্ত্র অশ্রুজল, বর্ম্ম অভিমান। সেই অভিমান বর্ম্ম পরিধান করিয়া যখন তিনি মান করিয়া বসেন, তখন শত শত ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণও তাঁহার মান ভাঙ্গিতে পারেন না। তখন পাণ্ডবকুলতিলক স্বয়ং মহাবীর ধনঞ্জয় গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া আসিলেও তাঁহাকে কথা বলাইতে সমর্থ হইবেন না। একি কম বীরত্ব!

* * * *

বীরবালা বীরপত্নী রোহিলা রমণীগণ পরমানন্দে দিনপাত করিতেছেন। রোহিলা জননী ক্রোড়স্থিত রোরুদ্যমান শিশু সন্তানকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন, "আজ অপরাহ্নে তোমার বাবা সংগ্রামক্ষেত্র হইতে একটা ইংরাজ ধরিয়া আনিবেন। আমরা তাহাকে খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখিব।" কোথাও চার পাঁচজন রোহিলা রমণী একত্র হইয়া নানা গল্প করিতেছেন। তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রবীণা রমণী বলিতেছেন, "যখন দিল্লীর সম্রাট্ আলি মহম্মদকে ধৃত করিয়া কয়েদ রাখিয়াছিল, তখন আমার পিতা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিল্লীতে যাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।"

মহবত খাঁর জননী বড় আস্ফালন পূর্ব্বক বলিতেছেন, "এবার হাফেজ জানিতে পারিবেন, আমার মহবত কেমন যোদ্ধা।"

এই মহবত খাঁর সঙ্গে হাফেজ নন্দিনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। এই ঘটনার ছয় সাত মাস পূর্ব্বে ইহাদিগের বিবাহ হইত। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ সমুপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই এপর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই।

হাফেজের গৃহে তাঁহার স্ত্রী এবং ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা যুদ্ধার্থীদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া আহারের পূর্ব্বে বেলা নয় ঘটিকার সময় কোরাণ পাঠ করিতেছেন। কোরাণের মধ্যে এক স্থান হইতে হাফেজ নন্দিনী পাঠ

করিলেন—"বিশ্বাসীদিগের পরিচালক ও নেতা একমাত্র পরমেশ্বর। সুতরাং পরমেশ্বর যাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন এ সংসারে কোটী কোটী মানুষও তাহার কিছু করিতে পারে না।"

হাফেজ নন্দিনী এই কথাটী পাঠ করিলে পর হাফেজের স্ত্রীর হৃদয় বড় প্রফুল্ল হইল। তিনি সহাস্য বদনে কন্যাকে বলিলেন—

"তোমার পিতা বিশ্বাসী লোক। স্বয়ং পরমেশ্বর নিশ্চয়ই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। এ যুদ্ধে ঈশ্বর তাঁহার সহায়।"

হাফেজ নন্দিনী মাতাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু লজ্জায় সে কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না। তিনি কিছুকাল নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কিন্তু কথাটী জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত প্রগাঢ় ইচ্ছা হইয়াছে। তখন প্রকারান্তরে আপন উদ্দেশ্য সাধনার্থ মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, যত লোক যুদ্ধে গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বোধ হয় বিশ্বাসী লোক। ফায়েজ উল্লা কি বিশ্বাসী নহেন?"

মাতা বলিলেন—"সকলেরই ঈশ্বরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে। কিন্তু তোমার পিতার জীবন্ত বিশ্বাস। ফায়েজউল্লা উজীরকে আশি লক্ষ টাকা দিয়াও বিবাদ মিটাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তোমার পিতা সে পথ অবলম্বন করিলেন না। তিনি বলিলেন, "ভয় নাই ফায়েজ উল্লা, ঈশ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না।"

কন্যা মাতার নিকট হইতে আপন অভিলষিত উত্তর প্রাপ্ত হইলেন না। সুতরাং লজ্জাবনত মুখে অগত্যা অভিপ্রেত প্রশ্ন স্পষ্টাক্ষরে জিজ্ঞাসা করিতে হইল।

তিনি অধোবদনে মাতার নিকট তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, মহবৎ খাঁ বিশ্বাসী লোক নহেন?"

মাতা কন্যার প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। কন্যা যে উদ্দেশ্যে এই সকল প্রশ্ন করিতেছেন, তাহা এখন বুঝিতে পারিলেন। কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"মহবতের অন্তর মহবতে * পরিপূর্ণ। যাহার অন্তরে মহবত আছে পরমেশ্বর সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে থাকেন।"

এইরূপে রোহিলা রমণীদিগের ঘরে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে।

* মহবত শব্দের অর্থ—দয়া।

এ দিকে বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। সায়ংকালে ভগ্ন সৈন্যসহ ফায়েজ উল্লা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রোহিলাশ্রেষ্ঠ অশীতিবর্ষ বয়স্ক হাফেজ রহমত খাঁ স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সহ সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন—রোহিলা সৈন্যগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে—এই দারুণ সংবাদ পৌঁছিবামাত্র ঘরে ঘরে হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। অকস্মাৎ যেন বিনা মেঘে সকলের মস্তকে বজ্রপাত হইল।

হাফেজ রহমতের স্ত্রী স্বামীপুত্রশোকে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কন্যাকে অপেক্ষাকৃত সমধিক শোকাতুরা দেখিয়া নিজের উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক কন্যাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

ফায়েজউল্লা এখন হাফেজের গৃহে আসিয়া পৌঁছেন নাই। হাফেজের স্ত্রী মনে করিয়াছিলেন, যে হয়ত ফায়েজ উল্লা তাঁহার স্বামী পুত্রের মৃত দেহ সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি হাফেজের শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বামীর বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি বাহির করিতে লাগিলেন। স্বামীর প্রিয় তরবারি খানি বাহির করিলেন। এই সকল মূল্যবান বসনে সুসজ্জিত করিয়া এবং তরবারি খানি হাতে দিয়া স্বামীর মৃত দেহ ভূগর্ভে রাখিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন।

এই সময়ে হাফেজের কনিষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে করিয়া ফায়েজ উল্লা হাফেজের গৃহে পৌঁছিলেন। হাফেজের স্ত্রী স্বামীর মৃত দেহ আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত দ্রুত পদে বাহিরে আসিলেন। স্বামীর প্রিয় তরবারি খানি এখনও তাঁহার হস্তে রহিয়াছে।

কিন্তু স্বামীর মৃত দেহ না দেখিয়া সক্রোধে ফায়েজ উল্লাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "হতভাগ্য তোর পিতৃসদৃশ খুল্ল পিতামহের মৃত দেহ সমর ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিস? অদৃষ্টে এই ছিল যে, হাফেজের মৃত দেহ পশু পক্ষীর আহার হইল।"

ফায়েজ উল্লা লজ্জা এবং অপমানে মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। তিনি তখন বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলিলেন "মা, এ গোলামের কোন অপরাধ নাই। পিতামহের আদেশানুসারেই সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল যে পিতামহের পদানুসরণ করি। কিন্তু কেবল তোমাদিগের ইজ্জৎ রক্ষার্থ এই ঘৃণিত জীবন ধারণ করিতেছি।

ফায়েজউল্লার এই কথা শুনিয়া হাফেজের স্ত্রী আবার কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"রোহিলারমণী কি এখন পলায়ন করিয়া ইজ্জাৎ রক্ষা করিবে? রোহিলাগণ সমরশায়ী হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগের তরবারি এখনও গৃহে পড়িয়া রহিয়াছে। দেখ,—এই তরবারি কি রমণীগণের ইজ্জাৎ রক্ষা করিতে অসমর্থ? যে তরবারি রোহিলা বীরের হস্তে থাকিয়া শত্রুর শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক এতকাল আমাদিগের ইজ্জাৎ রক্ষা করিয়াছে, আজ নিরাশ্রয়া অবলা রোহিলারমণীগণ নর পিশাচের আক্রমণ হইতে ধর্ম্ম রক্ষার্থ ইহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে কি অসমর্থা? পলায়নের প্রয়োজন কি? সুতীক্ষ্ণ তরবারের সাহায্যে এখনই স্বামী পুত্রের সহিত সম্মিলিত হইব। তোর মনুষ্যাত্মা নাই। তুই সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া রোহিলাশ্রেষ্ঠ আলিমহম্মদের নাম কলঙ্কিত করিয়াছিস্। এখনই পুনর্ব্বার সমরক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নর পিশাচ উজীরের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক রোহিলা কলঙ্ক দূর কর।"

"আলি মহম্মদের নাম কলঙ্কিত করিয়াছিস," এই কথা হাফেজ পত্নীর মুখ হইতে বাহির হইবা মাত্র ফায়েজ উল্লা তৎক্ষণাৎ কটিদেশ হইতে তরবারি বাহির করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। পশ্চাৎ হইতে হাফেজের কনিষ্ঠ পুত্র এবং সম্মুখ হইতে হাফেজের স্ত্রী ফায়েজউল্লার দুই হস্ত সজোরে ধরিয়া রাখিলেন।

ফায়েজউল্লাকে অভিমানে এইরূপ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত দেখিয়া, হাফেজ পত্নীর হৃদয়ে মাতৃস্নেহের উদয় হইল। আর তাঁহাকে কোন তিরস্কার করিলেন না। আপন ক্রোড়ে বসাইলেন। উভয়ের চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল।

সমস্ত দিবস সংগ্রামক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া ফায়েজউল্লার মুখমণ্ডল পরিশুষ্ক হইয়াছে। হাফেজ নন্দিনী স্বীয় ভ্রাতা এবং ভ্রাতষ্পুত্র ফায়েজউল্লাকে গ্লাসে করিয়া উৎকৃষ্ট সরবত প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি স্বহস্তে ইহাদিগের শোণিত সিক্ত শরীর ধৌত করিতে লাগিলেন।

সংগ্রামক্ষেত্রে যে সকল রোহিলা বীর নিহত হইয়াছেন তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিবার সময় হাফেজ পুত্র মহবত খাঁর নাম উল্লেখ করিলেন। মহবতের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে স্বর্ণ প্রতিমা হাফেজ নন্দিনীর মুখ বিষাদের ছায়ায় সমাবৃত হইল।

কিছুকাল পরে ফায়েজ উল্লা সমুদয় স্ত্রীলোকদিগকে পলায়নের নিমিত্ত

প্রস্তুত হইতে বলিলেন। অন্যান্য অনেকানেক রমণী পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হাফেজের স্ত্রী স্বামীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপ্ত না করিয়া রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ফায়েজউল্লা অনন্যোপায় হইয়া অন্যান্য সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক সহ পলায়ন পূর্ব্বক পাহাড়ে উঠিলেন। হাফেজের স্ত্রীকে পাহাড়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে এখানে রাখিয়া গেলেন। হাফেজের কনিষ্ঠ পুত্র জননীর আদেশানুসারে পিতা এবং ভ্রাতার মৃত দেহ আনয়নার্থ সংগ্রাম ক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু পথে সুজাউদ্দৌলার সৈন্যগণ তাঁহাকে ধৃত করিল।• সুতরাং হাফেজের মৃত দেহ সেই সংগ্রাম ক্ষেত্রেই পড়িয়া রহিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

দস্যুতা।

যুদ্ধাবসানে নবাব সুজাউদ্দৌলা ইংরাজ সৈন্যদিগকে রোহিলখণ্ডের সমুদয় গ্রাম লুট করিতে আদেশ করিলেন। এক এক দল সৈন্য এক এক গ্রামে প্রবেশ করিয়া কি বণিক, কি কৃষক, কি ভূম্যধিকারী, কি ব্যবসায়ী লোক সকলের বাড়ী লুট করিতে লাগিল। গ্রামবাসিনী রমণীদিগের নাসিকা কর্ণ ছিন্ন করিয়া, তাহাদিগের গাত্রাভরণ হরণ করিতে লাগিল। অনেকানেক স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত কাড়িয়া নিয়া বিবস্ত্রাবস্থায় তাহাদিগকে নবাবের তাঁবুতে লইয়া চলিল। জগতের ইতিহাসে ঈদৃশ নৃশংস আচরণ অত্যল্পই পরিলক্ষিত হয়। চারি পাঁচ দিবস যাবত্ সৈন্যদিগকে এইরূপ দুর্ব্যবহার করিতে দেখিয়া জেনেরেল চ্যাম্পীয়নের হৃদয়ও বিগলিত হইল। তিনি সৈন্যগণের এই পৈশাচিক আচরণ নিবারণার্থ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট এক পত্র লিখিলেন। কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংস জেনারেল চ্যাম্পীয়নের পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "ইংরাজ সৈন্যদিগকে নবাব সুজাউদ্দৌলার আদেশানুসারে কার্য্য করিতে হইবে। সুজাউদ্দৌলা যেরূপ কার্য্য করিতে বলেন, তাহাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। তোমার এ বিষয় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।"

জেনেরেল চ্যাম্পীয়ন হেষ্টিংসের এই পত্র পাইয়া নির্ব্বাক্ রহিলেন। এদিকে ইংরাজ সৈন্যগণ যুদ্ধের পর প্রায় একমাস যাবত্ গ্রাম লুট করিতে লাগিল। শত শত স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিল। অসংখ্য অসংখ্য রোহিলা রমণী আত্মঘাতিনী হইলেন।

লোক পরম্পরায় সুজাউদ্দৌলা শুনিলেন, যে, হাফেজ রহমতের স্ত্রী এবং কন্যা এখনও হাফেজের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত কয়েকজন সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

যে সকল ইংরাজ এবং দেশীয় সিপাহী গ্রাম লুট করিবার নিমিত্ত দলে দলে প্রেরিত হইতে ছিল, তাহাদিগের মধ্যে অমর সিংহ নামে একজন দেশীয় সিপাহী ছিল। অমর সিংহ সুবেদার নেহাল সিংহের পুত্র বলিয়া পরিচিত। নেহাল সিংহ দীর্ঘকাল ইংরাজদিগের অধীনে সুবাদারী কার্য্য করিয়া বক্সারের (Buxar) যুদ্ধে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। নেহাল সিংহ জীবিত থাকিতেই অমর সিংহ সিপাহীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বক্সারের যুদ্ধে বিশেষ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া ছিলেন। রেজিমেণ্টের মধ্যে প্রায় সকলেই অমর সিংহকে বিশেষ শ্রদ্ধা করে।

গ্রাম লুট করিবার সময় যে যে গ্রামে অমরসিংহ উপস্থিত ছিল সেই সমুদয় গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে সে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। প্রাণান্তেও অমর সিংহ কোন সিপাহীকে কোন স্ত্রীলোকের গাত্রস্পর্শ করিতে দিত না। কিন্তু যে সকল গ্রাম লুট করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ইংরাজ এবং দেশীয় সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা স্ত্রীলোকদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিল।

কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কাহাকেও অত্যাচার করিতে দেখিলে অমর সিংহের চক্ষের জলে দুই গণ্ড ভাসিয়া যাইত। সময়ে সময়ে এইরূপ নৃশংস ব্যবহার দর্শনে সে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিত।

হাফেজ রহমতের স্ত্রী ও কন্যাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত যে কয়েকজন সৈনিক পুরুষ প্রেরিত হইয়াছিল তন্মধ্যে লেফ্টেন্যাণ্ট টম্সন্ এবং এন্সাইন্ (Ensign) মেল্বিল্ প্রভৃতি চারি পাঁচজন ইংরাজ আর অমর সিংহ প্রভৃতি পঞ্চাশজন দেশীয় সিপাহী ছিল। অমর সিংহের এবার আর হাফেজের কন্যা ও স্ত্রীকে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিবার সুযোগ রহিল না। এক

দিকে তাহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সুজাউদ্দৌলার স্পষ্ট হুকুম রহিয়াছে, পক্ষান্তরে এন্‌সাইন্ মেল্‌বিল্ এবং লেফ্‌টেন্যাণ্ট টমসন্ প্রভৃতির হস্তেই এ যাত্রার কর্ত্তৃত্ব ভার রহিয়াছে। তাহারা যে অমরসিংহের অনুরোধে কার্য্য করিবেন, এইরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

সৈন্যগণ হাফেজের বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখিল, যে, বাহির খণ্ডের সমুদয় গৃহ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। হাফেজের স্ত্রীর যে দুই চারি জন ভৃত্য ছিল তাহারাও সৈন্যের আগমনে পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে। সৈন্যগণ দ্বার ভাঙ্গিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। হাফেজের স্ত্রী সৈন্য গণকে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই বুঝিলেন, যে, ইহারা তাঁহাকে এবং তাঁহার কন্যাকে ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছে। তিনি অন্দরের মধ্যে সম্মুখের দুই তিনটি প্রকোষ্ঠের দ্বার ক্রমে রুদ্ধ করিয়া সকলের পশ্চাতের প্রকোষ্ঠে কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। জননী এবং কন্যা উভয়ের নয়ন জলে তাহাদের পরিধেয় বসন সিক্ত হইয়া উঠিল। পরে জননী উঠিয়া অন্য এক প্রকোষ্ঠ হইতে দুই খানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে করিয়া পুনর্ব্বার কন্যার নিকট আসিলেন। ইহার একখানি ছুরিকা আপন কেশ রাশির মধ্যে রাখিলেন। দ্বিতীয় খানি কন্যার আলুলায়িত কেশের মধ্যে রাখিয়া তাহার সেই সুদীর্ঘ কেশ বিনাইয়া বান্ধিতে লাগিলেন। কন্যা তাঁহার অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সজল নয়নে মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মা চুলের নীচে ছুরী রাখিলে কেন?"

জননী। বাছা, এই তোমার হত ভাগিনী জননীর শেষ দান।

হাফেজ নন্দিনী ইহাতেও মাতার অভিপ্রায় কিছু বুঝিতে পারিলেন না। ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী, এপর্য্যন্ত বিপদ কাহাকে বলে কথনও জানেন না। সুতরাং অবাক হইয়া জননীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

জননী তখন উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক বলিলেন—"বাছা এসংসারে সকল সময়ের দান একপ্রকার নহে। এক সময়ে তোমার এই হত ভাগিনী জননী তোমাকে বুকের উপর রাখিয়া স্তন পান করাইত; তোমার প্রফুল্ল মুখচন্দ্রমা দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিত; এই বক্ষের উপর তোমার শয্যা পাতিয়া রাখিত; কিন্তু আজ আবার তোমার সেই জননীই তোমাকে আত্মহত্যা করিবার নিমিত্ত অস্ত্র প্রদান করিতেছে। এই বিষ মাখিত ধারা-

ত্মক অস্ত্র তোমার ইজ্জাৎ রক্ষার একমাত্র উপায়। এই তোমার জননীর শেষ দান, শেষ আশীর্ব্বাদ।

কন্যা বলিলেন, মা "তবে এখানে বসিয়া এখনই কেন আত্মহত্যা করি না? ছুরিকা কেশের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার প্রয়োজন কি?"

জননী। (বীরদর্পে) "এখানে আত্মহত্যা করিবে কেন? আমরা মনুষ্য জীবন ধারণ করি না? মানুষের ন্যায় এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। হাফেজের স্ত্রী, হাফেজের কন্যা বিড়াল কুকুরে ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে?"

"এই বিষাক্ত মারাত্মক ছুরিকাদ্বারা অগ্রে শত্রুকে সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। তোমার পিতৃবৈরী বিনাশ না করিয়া এ সংসার পরিত্যাগ্ করিব না। হয় তোমার হাতে, না হয় আমার হাতে, সেই নরপিশাচ উজীরের মৃত্যু নিশ্চয়ই লিখিত রহিয়াছে। সাবধান, তাহাকে বিনাশ না করিয়া আত্মহত্যা করিবে না।"

কন্যা। আমরা শত্রুকে কিরূপে বিনাশ করিব?

জননী। নর পিশাচ যখন কামাসক্ত হইয়া হাফেজ কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইবে, তখন এই ছুরিকা নিশ্চয়ই তাহার বক্ষে প্রবেশ করিবে। বাছা! স্মরণ রাখিবে যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও ইজ্জাৎ রক্ষা করিতে হইবে। ভুলিবে না যে তুমি হাফেজের কন্যা। হাফেজের পবিত্র শোণিতে তোমার শরীর গঠিত হইয়াছে।

জননী কন্যাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া আবার বারম্বার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন; সতৃষ্ণ নয়নে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কন্যা মাতার মুখের দিকে চাহিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। কিন্তু জননী আবার সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন

"ভয় কি বাছা! তোমার পিতা আপন রাজ্য এবং প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হইয়াছে। আমরাও আর দুই চারি দিন পরে এ দুঃখের সংসার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইব। তুমি নির্ভয়ে——"

হাফেজ পত্নীর কথা শেষ হইতে না হইতে সৈন্যগণ দ্বারভগ্ন করিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। তরবারি হস্তে হাফেজের স্ত্রী সৈন্যদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

যদি আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া থাক, আমরা এখনই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইব।”

হাফেজ পত্নী রোহিলা ভাষাতে এই সকল কথা বলিলেন। এনসাইন্ মেল্‌বিল্ এবং লেফ্‌টিন্যাণ্ট টম্‌সন্ ইহার এক কথাও বুঝিতে পারিলেন না।

সেখানে অমর সিংহ এবং জমাদার আবেদালি খাঁ উপস্থিত ছিল। অমর সিংহ এই রূপ বিশুদ্ধ উর্দ্দু বড় বুঝিত না, কিন্তু তত্রাচ হাফেজ পত্নীর মনোগত ভাব সে বুঝিতে সমর্থ হইল। আবেদালি খাঁ অযোধ্যার লোক সে সহজেই তাঁহার কথা বুঝিল এবং সাহেব দ্বয়কে হাফেজ পত্নীর সমুদয় কথা বুঝাইয়া বলিল।

লেফটিন্যাণ্ট টম্‌সন্ আবেদালির কথায় কোন মনোযোগ প্রদান করিলেন না। তিনি মেলবিল্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন।

“Dear Melville, this old woman is setting her cap for you. She is a pretty old girl. You may accapt her offer if you please প্রিয় মেলবিল, তোমার প্রতি এই বৃদ্ধা রমণীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। এ অতি সুন্দরী বৃদ্ধা বালিকা। তুমি ইচ্ছা করিলে ইহাকে গ্রহণ করিতে পার।”

মেল বিল্ টম্‌সনের কথা শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, যে, টম্‌সন্ বড় দুষ্ট। আমার ঘাড়ে এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটা দিয়া নিজে বোধ হয় এই পরমা সুন্দরী যুবতীকে নিতে চাহেন। কিন্তু টমসনের সে আশা বৃথা। নবাবের স্পষ্ট হুকুম রহিয়াছে যে হাফেজ রহমতের স্ত্রী ও কন্যাকে স্বয়ং নবাবের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। হাফেজের স্ত্রী এবং কন্যাকে পাল্কীতে করিয়া নিতে নবাব হুকুম করিয়াছেন। বোধ হয় নবাব স্বয়ং ইহাদিগকে রাখিবেন।

মেল্‌বিল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে টমসনকে বলিলেন

“Dear Thompson, these prizes are not for us, they are intended for the Nabab himself.”

প্রিয় টম্‌সন্ এ পুরস্কার আমাদের প্রাপ্য নহে। নবাব স্বয়ং ইহাদিগকে রাখিবেন্।

টমসন। Nabab has already in his seraglio three thousands and three hundred women. Does he want more? নবাবের অন্দরে এখনও তিন হাজার তিন শত স্ত্রীলোক আছে। তিনি কি আরও চাহেন।

মেল্‌বিল্‌। Thompson what a fool you must be. The Koran, the religious book of the Nabab, says that a man must have as many women as there are stars in the sky. টম্‌সন্‌ তুমি কি নির্ব্বোধ। নবাবের ধর্ম্ম পুস্তক কোরাণে লিখিত আছে যে আকাশে যত তারা আছে পুরুষকে তত স্ত্রী বিবাহ করিতে হইবে।

টমসন। But the exact number of stars has not yet been ascertained. The best astronomer of our days have failed to ascertain it. How is the Nabab to know the exact number he requires according to the Koran. কিন্তু স্বর্গে কত তারকা আছে তাহা এখন পর্য্যন্তও অবধারিত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ এই বিষয় অবধারণ করিতে পারেন নাই। তবে নবাব কি রূপে ঠিক করিবেন যে কোরাণ অনুসারে তাহার কত স্ত্রীলোক রাখিতে হইবে।

মেলবিল। So the best Persian scholar, our Governor Warren Hastings, has not yet been able to ascertain the exact number of women whom Nabab Meer Jaffer had kept in his seraglio. In both the cases the number must be without end. আমাদের গবর্ণরওয়ারেণ্‌ হেষ্টিংস পারস্য ভাষায় অত্যন্ত পণ্ডিত। কিন্তু নবাব মীরজাফরের কত গুলি বেগম ছিল তাহা আজ পর্য্যন্ত তিনি নির্ণয় করিতে পারেন নাই। স্বর্গের তারকার সংখ্যাও অনির্দ্দিষ্ট। নবাবদের বেগমের সংখ্যাও চিরকাল অনির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

টম্‌সন্‌। Dear Melville, I do not believe what you say is written in the Koran. You have never read the Koran. Have you? প্রিয় মেল্‌বিল্‌ আমার বিশ্বাস হয় না যে তুমি যাহা বলিলে তাহা কোরাণে লিখিত আছে। তুমি কখনও কোরাণ পাঠ কর নাই। তুমি কি নিজে কোরাণ পাঠ করিয়াছ?

মেল্‌বিল্‌। That drummer boy, Hossunali Khansama's son, told me it is written in the Koran that a man must have as many women as there are stars in the sky. My khansama Hossunali must be a great Arabic scholar. He says his

nomaz six times a day, and his son, the drummerboy, must have given a very faithful account of the Koran. আমার খানসামা হোসনালীর পুত্র সেই ডুন্দভিওয়ালা বালক আমাকে বলিয়াছে যে কোরাণে লিখিত আছে আকাশে যত তারা আছে এক এক পুরুষের তত স্ত্রী বিবাহ করা উচিত। আমার হোসনালী খানসামা অবশ্যই আরব্য ভাষা ভাল জানে। সে দিনে ছয় বার নেমাজ পড়ে। তাহার পুত্র অবশ্য কোরাণের প্রকৃত কথাই বলিয়াছে।

টম্‌সন্। Does that drummer boy teach you the Koran? Do you often read it with him? সেই ডুন্দভিওয়ালা বালক কি তোমাকে কোরাণ পড়ায়। তুমি কি তাঁহার সঙ্গে একত্রে কোরাণ পাঠকর।

মেলবিল। I never bother my head with the Koran. Yesterday when we captured nearly thirty Rohilla women and dragged them naked to the Nabab's camp, the Nabab made them over to the soldiers, saying that he has already kept one hundred women, and at present he wanted no more. Out of those thirty women three were brougth to me by that drummerboy. I told him I would not keep more than one. The boy entreated me to keep all the three, and said, "Hazoo, keep them all. It is written in the Koran that a man must have as many wives as there are stars in the sky. আমি কখনও কোরাণ পাঠ করি না। ওসব আমার ভাল লাগে না। গত দিবস আমরা প্রায় ত্রিশজন রোহিলা স্ত্রীলোককে ধরিয়া একেবারে বিবস্ত্রাবস্থায় নবাবের তাম্বুতে লইয়া গিয়াছিলাম। নবাব বলিলেন যে, এক শত স্ত্রীলোক তিনি এইমাত্র রাখিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার আর স্ত্রীলোকের প্রয়োজন নাই। তিনি তখন সে ত্রিশজন স্ত্রীলোককে সৈন্যদিগকে দান করিলেন। তাহাদিগের মধ্য হইতে তিন জন স্ত্রীলোক সেই ডুন্দভিওয়ালা বালক আমার নিকট আনিয়াছিল। আমি বলিলাম যে এক জনের অধিক আমি রাখিব না। তখন সে বালক বলিল, "হুজুর তিন জনই রাখুন। কোরাণে লিখিত আছে আকাশে যত তারা আছে এক এক পুরুষের তত স্ত্রী রাখা কর্ত্তব্য।"

টমসন। Then the Koran must be an excellent book, an extraordinary good book. Fling away the Bible. Down with the Bible. In this hot climate we must all follow the Koran to its very letter. তবে কোরাণ তো বড় ভাল পুস্তক। দূর হউক বাইবেল। চুলায় যাউক বাইবেল। এ উষ্ণ দেশে আমরা সকলে কোরাণের লিখিত ধর্ম্মাবলম্বন করিব।—

যখন টম্‌সন্ এবং মেল্‌বিল্ পরস্পরের সহিত এইরূপ কথা বার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন স্থানান্তরে অন্যবিধ দৃশ্য সমুপস্থিত হইল। সেখানে অন্য প্রকারের কথা বার্ত্তা হইতেছিল।

হাফেজের স্ত্রী এবং কন্যার প্রকোষ্ঠে লেফটেন্যাণ্ট টমসন, এনসাইন জর্জ, আবেদালি জমাদার এবং অমর সিংহ এই চারি জন প্রবেশ করিয়াছিল। লেফ্‌টেন্যাণ্ট টম্‌কিন্, হুজোৎ খাঁ এবং এরফান্‌আলি প্রভৃতি আর দশ বিশ জন গৃহের জিনিষ পত্র অপহরণ করিতেছিল। এতদ্ভিন্ন অপরাপর সিপাহী গণের মধ্যে কেহ বাহির খণ্ডে বসিয়া তাম্রকুট সেবন পূর্ব্বক পথশ্রান্তি দূর করিতে লাগিল, কেহবা এদিক ওদিক গমনাগমন করিতে লাগিল।

নাদেরালি জমাদার হাফেজের স্ত্রীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া অনেকক্ষণ সেখানে ছিল না। লেফটেন্যাণ্ট টমসনের আদেশানুসারে সে পাল্কী বেহারা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল লেফটেন্যাণ্ট টম্‌সন্, মেল্‌বিল্ এবং অমর সিংহই প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া রহিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি কাহাকেও অত্যাচার করিতে দেখিলে অমর সিংহের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইত। অমর সিংহ প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাফেজনন্দিনীর লাবণ্যময়ী সরলতা পরিপূর্ণ পবিত্র মুখকমল দর্শনে একেবারে বিস্মিত হইল। সে অনিমেষ নেত্রে স্পন্দহীন পুত্তলের ন্যায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, জগন্মোহনমূর্ত্তি এই স্বর্গীয় প্রতিমা বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। কিন্তু ইহার ভাবী দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া অমর সিংহের হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। এইরূপ পবিত্র মূর্ত্তি যে নর পিশাচ কামাসক্ত নবাব সুজাউদ্দৌলার হস্তে সমর্পিত হইবে, এ চিন্তা তাহার একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিল। অমর সিংহ তখন বারম্বার আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সত্য

সত্যই কি সংসারে পরমেশ্বর নাই? আছেন ইহা বলি কি প্রকারে। তিনি থাকিলে ঈদৃশ দেববালাকে এই প্রকার বিপন্নাবস্থায় কখনও পরিত্যাগ করিতেন না। ইহার পবিত্র মুখকমল দেখিলে মানুষের হৃদয়ে ইহার প্রতি স্নেহ এবং দয়ার সঞ্চার হয়; ইহাকে নরপিশাচদিগের অপবিত্র স্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা হয়। তবে ঈশ্বর পরম দয়াবান হইয়া কি প্রকারে ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন? বোধ হয় যদি এসংসারে কোন ঈশ্বর থাকেন, তিনি দয়াময় নহেন। তিনি সর্ব্ব শক্তিমান। তিনি সর্ব্ব শক্তিমান না হইলে, ঈদৃশ অলৌকিক রূপলাবণ্য, ঈদৃশ পবিত্রভাব একাধারে সংঘটিত হইত না। সর্ব্ব শক্তিমান না হইলে, এই দেবতার ন্যায় রূপবতীকে কখন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেন না। কিন্তু তবে কি ঈশ্বর অত্যন্ত নিষ্ঠুর? শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে পরম দয়াল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তবে কি শাস্ত্র মিথ্যা? না শাস্ত্র কখন মিথ্যা নহে। শ্রীনিবাস পণ্ডিত যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য। মানুষকে মানুষ রক্ষা করিবে, এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যের মনে দয়া এবং স্নেহ প্রদান করিয়াছেন বিপদ হইতে মনুষ্যকে রক্ষা করিবার উপায় তিনি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তবে আর ঈশ্বরে দোষারোপ করি কেন? যে পরমেশ্বর শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধ প্রদান করিয়াছেন, তিনি নিষ্ঠুর ইহাও কি সম্ভবপর? মানুষ বিপদাবস্থায় পড়িলে অন্যান্য লোক তাহার উদ্ধার করিবে, ইহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। কিন্তু এ সংসারে মানুষ মনুষ্য প্রকৃতি ভ্রষ্ট হইয়া, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে বিরত থাকে। প্রত্যেকে আপন আপন কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করে; সুতরাং পরিণামে তাহাদিগকে আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়।"

অমরসিংহ একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট টম্‌সন্ এবং মেলবিল্ পূর্ব্বোল্লিখিত প্রণালীতে কোরাণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। কখন কখন হস্ত পদাদি সঞ্চালনপূর্ব্বক বীররসে প্রমত্ত হইয়া কথা বলিতেছেন। হাফেজ নন্দিনী টম্‌সন্ এবং মেলবিলকে উচ্চৈঃস্বরে বাদানুবাদ করিতে দেখিয়া একটু ভীত হইলেন। ইঁহারা ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা বলিতে ছিলেন। ইঁহাদের কোন কথা তাঁহার বুঝিবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু ইঁহাদের ভাব ভঙ্গী দর্শনে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি একটু সরিয়া যাইয়া আপন মাতার নিকটে দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা

হাফেজ পত্নী নিঃশঙ্ক হৃদয়ে বসিয়া আছেন। ভীতি ভাবনাকে তিনি এজন্মের মত বিদায় দিয়াছেন। কন্যাকে ভয়ে কাঁপিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভয় কি বাছা! মৃত্যু সকল দুঃখ কষ্ট শেষ করিবে। সত্বরই এই দুঃখ কষ্টের অবসান হইবে। মৃত্যুর ঔষধ তো আমাদের সঙ্গেই রহিয়াছে।"

বৃদ্ধার এই কথা টমসন্ কিম্বা মেল্‌বিল্ শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু অমর সিংহের কর্ণে এই শব্দ কয়েকটী প্রবেশ করিল। অমরসিংহ রোহিলা দিগের ভাষা বড় বুঝিত না। কিন্তু বৃদ্ধার এই কথা কয়েকটীর অর্থ সহজেই তাহার উপলব্ধি হইল।

"মৃত্যু সকল দুঃখ কষ্ট শেষ করিবে" এই কথাটী অমরসিংহের যেন নিদ্রা ভঙ্গ করিল। অমরসিংহ ঘোর মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইল।

সে তখন আপন মনে মনে বলিল, "এতো ঠিক কথা। মৃত্যু সংসারের সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা দূর করিতে পারে। কিন্তু তবে আমি মৃত্যুকে কেন আলিঙ্গন করি না? এই অনিত্য দেহ কেন আমি এই স্বর্গীয় বালা হাফেজ নন্দিনীর উদ্ধারার্থ বিসর্জ্জন করি না? তাহা হইলে একদিকে মৃত্যু আমার সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা দূর করিবে। পক্ষান্তরে যে অকিঞ্চিৎকর অনিত্যদেহ রোগাক্রান্ত হইয়া এখনই পতিত হইতে পারে; যে অনিত্য দেহ মুহূর্ত্তের নিমিত্তও আমার রক্ষা করিবার সাধ্য নাই, সেই অকিঞ্চিৎকর পদার্থের বিনিময়ে এইরূপ মহদুদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবে। আমি রাক্ষসের হস্ত হইতে রমণীদ্বয়কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জ্জন করিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম এ জীবন বিসর্জ্জন করিব।

"আমার এজীবন ধারণে কোন ফল নাই। আমার হৃদয়তো অহর্নিশ শোকে দগ্ধ হইতেছে। এ সংসারের রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইলেও তো আমি কখনও সুখী হইব না। পিতৃ মাতৃ শোক, স্ত্রীর শোক, ভগ্নীর শোক সর্ব্বদাই আমাকে অসহনীয় যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। পরে যিনি পিতৃস্থানীয় হইয়া আমার জীবন রক্ষা করিলেন, সাধ্যানুসারে আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে এই অস্ত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তিনিও সে বৎসর বক্‌সারের যুদ্ধে আহত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এ অবস্থায় আমার এই পাপ জীবন ধারণ বিড়ম্বনামাত্র। কোন এক সৎকার্য্যে এ জীবন উৎসর্গ করিতে পারিলেই চরমে সদ্গতি লাভ হইবে। বিশেষতঃ যদি পিতা মাতা স্ত্রী এবং ভগ্নীর মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে ইহলোক

পরিত্যাগ মাত্রই তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ লাভ করিব। হায়! হায়! এমন দিন কি আমার কখন হইবে, যে, আবার সেই জননীর স্নেহময় মুখ দেখিতে পাইব? তখন মার পদতলে পড়িয়া বলিব, "মা তোমার সেই হতভাগ্য সন্তান প্রাণের ভয়ে নরপিশাচের হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করিবার চেষ্টাও করে নাই।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, অমর সিংহ ক্ষিপ্তের ন্যায়, অথবা স্বপ্নাবস্থাপন্ন লোকের ন্যায় মা মা বলিয়া উঠিল।

হাফেজের পত্নী আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইহাঁদিগের চারি চক্ষু একত্র হইবামাত্র পরস্পরের সদ্ভাব উপস্থিত হইল। মনুষ্যদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রেম ও ভালবাসা অস্পষ্টভাবে এবং অজ্ঞাত-সারে পরস্পরের হৃদয় আকর্ষণ করে। হাফেজের স্ত্রীর মনে হইল যে ইনি শত্রু নহেন, বন্ধু হইবেন।

অমরসিংহ আবার আত্মসংযম পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিল, "ঠিক কথা, মৃত্যুই আমাকে কেবল সুখী করিতে সমর্থ। বিশেষতঃ এই নিরাশ্রয়া হাফেজ নন্দিনী এবং হাফেজ পত্নীর উদ্ধারার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিলেই মৃত্যু আমার নিমিত্ত স্বর্গের দ্বার উন্মোচন করিবে। ইহাতেই আমার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

"কিন্তু কি প্রকারে ইহাদিগকে উদ্ধার করিব? আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন সৈনিক পুরুষ ইহাঁদিগকে ধৃত করিতে আসিয়াছি। ইহার মধ্যে আমি ভিন্ন আর সকলেই ইহাঁদিগকে নর পিশাচ সুজা উদ্দোলার নিকট লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবে। এই উন পঞ্চাশ জন লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, কি ইহাঁ-দিগকে উদ্ধার করিতে পারিব? পারিব বই কি? পিতার নিকট যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে ইহার তিন চারিটা ইংরাজকে এখনই আমি যুদ্ধে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারি। কিন্তু তাহা হইলেও তো ইহাঁদিগকে উদ্ধার করিতে পারিব না। ইহাঁরা স্ত্রী লোক, বিশেষতঃ উচ্চ কুলোদ্ভবা। আমার সঙ্গে পদব্রজে গমন করিয়া ইহাঁরা পলায়নে সমর্থা হইবেন না। এখন দেশের স্থানে স্থানে নবাব সৈন্য এবং ইংরাজ সৈন্য বিচরণ করিতেছে। এই পঞ্চাশ জনকে পরাস্ত করিতে পারিলেও তাহাতে কোন লাভ নাই। বন্দুক এবং কামান লইয়া, দশ বার জন সৈন্য একত্র হইলেই, অনায়াসে আমার প্রাণবিনাশ করিয়া ইহাঁদিগকে ধৃত করিতে পারিবে। কামান, বন্দুকই

ইংরাজ সৈন্যের এক মাত্র বল ভরসা। অসি যুদ্ধ কিম্বা শূল যুদ্ধ হইলে এক বার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম।

"কিন্তু এখানে এইরূপ চেষ্টা বৃথা। তাহাতে কেবল আমার প্রাণ বিনাশ হইবে, ইহাঁদিগের কোন উপকার হইবে না। উনপঞ্চাশ জন লোকের হস্ত হইতে একাকী ইহাঁদিগকে উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। তবে কি করিব? ইহাঁদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, কোন একটা উপায় অবধারণ করিতে পারিতাম, তবেই কৃতকার্য্য হইবার কতক সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইহাঁরা আমার কথা বুঝিবেন না। আমিও ইহাঁদিগের সকল কথা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ আমি ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে ইহাঁদিগকে ধৃত করিতে আসিয়াছি। ইহাঁরা আমাকেও শত্রু বলিয়া মনে করিতেছেন। আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাঁরা কখন আমার কথার উত্তর প্রদান করিবেন না। ইহাঁরা নবাবের স্ত্রী, নবাবের কন্যা। দুরবস্থায় পড়িয়াছেন বলিয়া কি এখন আমার ন্যায় এক জন ক্ষুদ্র সিপাহীর সহিত কথা বলিবেন? আমি এক জন সাধারণ সিপাহী। আমার [illegible] কত শত সিপাহী ইহাঁদিগের গোলাম ছিল। তবে কি করিব? ইহাঁদিগের সঙ্গে কথা বলিবার উপায় কি? অন্যান্য যে সকল সিপাহী ইহাঁদিগের কথা বুঝিতে পারিবে, যাহারা আমার মনের ভাব ইহাঁদিগকে বুঝাইয়া বলিতে পারিবে, তাহাদিগের নিকট আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে সমুদয় চেষ্টাই বিফল হইবে। এখনই আমার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া নবাবের নিকট লইয়া যাইবে। হায় কি বিপদ! আমাদের সঙ্গে এমন কি এক জন লোকও নাই যাহাকে বিশ্বাস করিয়া আমি আমার মনের কথা বলিতে পারি?

"ধন্য পরমেশ্বর! আছে আছে। বৃদ্ধ ছত্রসিংহ আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে। ছত্র সিংহ এদেশের ভাষা বিলক্ষণ জানে। ছত্র সিংহের হৃদয় একেবারে পাষাণ মণ্ডিত নহে। বিশেষতঃ বক্‌সারের যুদ্ধে আমি তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছি। সংগ্রাম ক্ষেত্রে সে আহত হইয়া পড়িলে, আমি দুই ক্রোশ পথ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া নিয়া গিয়াছিলাম। সকলেই সংগ্রামক্ষেত্রে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। তবে ছত্র সিংহ কি এত অকৃতজ্ঞ হইবে? আমার অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত করিয়া, সেও কি আমার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিবে? কখন না। ছত্র সিংহ অর্থলোভী নহে। সে কখন এত অকৃতজ্ঞ হইবে না।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, অমর সিংহ হাফেজের পত্নীর প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিয়া, ছত্রসিংহের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অন্যান্য সৈন্য গণ হাফেজের গৃহসামগ্রী অপহরণ করিতেছে। কিন্তু ছত্রসিংহ অর্থ-লোলুপ নহে। ছত্র সিংহের একটু গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস ছিল। সে বাহির বাড়ীতে অন্যান্য লোক হইতে একটু দূরে বসিয়া গাঁজায় দম দিতেছে। অনেকক্ষণ পরে গাঁজায় দম দিয়াছে, তাহার মন বড়ই প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

অমর সিংহ ছত্র সিংহের নিকট যাইয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার স্কন্ধের উপর হস্ত স্থাপন করিল। ছত্র সিংহ গাঁজায় একেবারে নিমগ্ন ছিল। চমকিয়া উঠিয়া, চাহিয়া দেখে যে অমর সিংহ তাহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়াছে। অমর সিংহকে ছত্রসিংহ প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাহাকে মনে করে। ছত্রসিংহ তখন গাঁজার কল্কী কাছে রাখিয়া, মনের আমোদে অমর সিংহের গলা জড়াইয়া ধরিয়া গান করিয়া উঠিল,

ভাই বুঝলে নারে গাঁজার মজা
কসে দম্ দিলে লোক হয় রাজা।

অমরসিংহ বলিল, "দাদা, তোমার নিকট একটা কথা বলিতে আসিয়াছি। কিন্তু ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া প্রতিজ্ঞা কর, একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।"

ছত্রসিংহ। ভাই তোর কাছে আবার প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে? তুই একবার আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিস্। আমি তোর জন্য এ প্রাণ দিতে পারি।

অমর সিংহ। ভাই তুমি হাফেজ রহমত খাঁর কন্যাকে এবং স্ত্রীকে দেখিয়াছ? অন্দরের মধ্যে তাঁহারা ধৃত হইয়াছেন। লেফটেন্যান্ট টম্‌সন্ এবং মেল্‌বিল্ সাহেব সেখানে বসিয়া আছেন।

ছত্রসিংহ। দেড় প্রহরের মধ্যে একবারও গাঁজা খাই নাই। আমি এখন গাঁজা ফেলিয়া সেই মাগীদের দেখিতে যাইব। তুই এক মজার লোক, আমি কেন সে মাগীদের দেখিতে যাব?

অমর সিংহ। দাদা হাফেজের কন্যার ন্যায় এমন সুন্দরী আর কোথাও

দেখি নাই। মুখ খানি যেন ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ। বোধ হয় ইহার চরিত্র এবং হৃদয় অত্যন্ত পবিত্র হইবে।

ছত্রসিংহ। নবাবের স্ত্রী, নবাবের মেয়ে, দুবেলা গরম জলে স্নান করে; ইহাতেও পবিত্র হইবে না?

অমরসিংহ। ভাই হাফেজের স্ত্রীকে দেখিলে তাঁহাকে আমার মা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হয়। ইহাঁদিগের মায়ে ঝিয়ের হৃদয় যেন দয়া ধর্ম্মে পরিপূর্ণ।

ছত্রসিংহ। বড় মানুষের মেয়ে অনেক টাকা কড়ি আছে। কাজেই সকলকে দয়া করে।

অমরসিংহ। দাদা, হাফেজের কন্যাটীকে সত্য সত্যই দেববালা বলিয়া বোধ হয়। আমি ইহাকে দেখিবামাত্রই আমার মনে হইল যেন ইনি আমার কনিষ্ঠা সহোদরা। এই প্রকার দেববালাকে আমরা কামাসক্ত নরপিশাচ সুজাউদ্দৌলার হস্তে অর্পণ করিব? ইহাঁদিগকে নবাবের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার কোন উপায় কি নাই?

ছত্রসিংহ। ভাই ও কথা মুখেও আনিস্ না। নিশ্চয়ই তোর এবার মাথা কাটা যাইবে। একেই তোর বড় বদ্‌নাম হইয়াছে। শালা এরফানআলি আর জোবানআলি সকলেই নবাবের নিকট বলিয়াছে, যে, তুই টাকা খেয়ে অনেকানেক রোহিলা স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিয়াছিস্। কত কত স্ত্রীলোককে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছিস্। নবাব তোমাকে চিনে না, তাই তোমার রক্ষা; কিন্তু নবাব জেনেরেল চ্যাম্পীয়ন সাহেবকে তোমার বরখাস্তের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন। তুমি নেহাল সিংহের পুত্র। যেরূপ ক্ষমতা এতদিনে সুবেদার হইতে পারিতে।

অমর সিংহ। ভাই আমি সুবেদারী চাই না, আমার নাম কাটিয়া দিলে এখনই চলিয়া যাইব। তোমাকে আমার একটা কাজ করিয়া দিতে হইবে।

এই সময়ে ছত্র সিংহ গাঁজায় আর এক দম দিয়া বলিল—"ভাই তোর একটা কাজ কেন? তোর পাঁচটা কাজ করিয়া দিব। এ প্রাণ তোর জন্য দিব। মরণকালে আমার যে দুই চারিটা টাকা থাকিবে, তোকে সব দিয়া যাব। তুই ভিন্ন আমার কে আছে?" আবার গানের স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,

"আমার কে আছে এ ত্রিভুবনে
গাঁজা আর ভাই অমর বিনে"

অমর সিংহ। দাদা, আমি হাফেজের স্ত্রী এবং কন্যার সঙ্গে কথা বলিতে চাহি। কিন্তু আমিতো তাঁহাদের কথা বুঝি না, তাঁহারাও আমার কথা বুঝিতে পারিবেন না। আমি যাহা যাহা বলিব, তুমি তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া বলিবে। আবার তাঁহারা যা বলেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিবে।

ছত্রসিংহ। তাহাদিগের সঙ্গে কি কথা বলিতে চাহ?

অমর সিংহ। এখানে তাহাদিগের পলায়নের সুবিধা করিয়া দিবার কোন উপায় নাই। লক্ষ্ণৌ নবাবের নিকট ইহাঁদিগকে উপস্থিত করিলে পর নিশ্চয়ই ইহাঁদিগের পলায়নের একটা সুবিধা করিয়া দিতে পারিব। তোমাকে এই বিষয়ে ইহাঁদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে।

ছত্রসিংহ। ভাই তুমি কম পাত্র নহ। এই সকল দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবেশ করিয়া, আপন প্রাণ হারাইবে। চুপকর, ওসকল কাজে হাত দিতে নাই।

অমর সিংহ। ভাই আমি প্রাণ দিয়াও ইহাঁদিগের উপকার করিব। যাহাতে ইহাঁদিগের ধর্ম্ম রক্ষা হয়, তাহার চেষ্টা করিব। সুজাউদ্দৌলা ইহাঁদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, নিশ্চয়ই তাহার প্রাণ বিনাশ করিব।

ছত্রসিংহ। তুই পাগল, তাই কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতেছিস্। মুসলমানের আবার ধর্ম্ম কি? এক এক মাগী সাত বার নিকা করে। তাদের আবার ধর্ম্ম। এ দুই মাগী লক্ষ্ণৌ গেলেই নবাবের বেগম হইয়া পড়িবে। তবে মা ঝি দুইটাকে একত্রে নিকা না করিলেও পারে। বুড়ীটাকে খোর্দ্দ মহলে রাখিবে। আর ঐ মেয়েটাকে কয়েক দিন বড় অন্দরে রাখিয়া পরে খোর্দ্দ মহলে* পাঠাইয়া দিবে।

অমর সিংহ। দাদা, সকল মুসলমান এক রকম নহে। মুসলমানের নাম শুনিলেই তোমার ঘৃণার উদয় হয়। আমি নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছি, এই দুইটী স্ত্রীলোক মনে মনে স্থির করিয়াছেন, নবাব ইহাঁদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, ইহাঁরা আত্মহত্যা করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন।

* নবাবদিগের উপপত্নী যে মহলে থাকে তাহাকে খোর্দ্দ মহল বলে।

ছত্রসিংহ। তাহা হইতেও পারে। রোহিলা স্ত্রীলোক গুলি বোধ হয় আমাদের হিন্দুর ঘরের মেয়ের মতন হইবে। সে দিন আমরা যে ত্রিশটা স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যের দশ বারটা স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। মেল্‌বিল্‌ সাহেবের ঘরে যে তিনটা ছিল, তাহারাও আত্মঘাতিনী হইয়াছে।

অমরসিংহ। তুমি আমার এই কাজটী করিবে কি না বল।

ছত্রসিংহ। গোপনে কথা বলিবার সুযোগ হইলে, আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এরফানআলি কি জোবানআলি সিপাহী জানিতে পারিলে সর্ব্বনাশ হইবে। ইহারা অন্যের বদ্‌নাম করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে সুবেদারী পাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছে। শালাদের যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই, যে, আপন ক্ষমতাবলে সুবেদারী পাইবে। কেবল লোকের বদ্‌নাম করিয়া জেনারেল সাহেবকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করে।

অমর সিংহ। গোপনে কথা বলিবার এক উপায় আছে। নবাব ইহাঁদিগকে পাল্কীতে করিয়া লইয়া যাইতে হুকুম দিয়াছেন। তুমি এবং আমি ইহাঁদিগের পাল্কীর কাছে কাছে থাকিব। বেহারাগণ পাল্কী রাখিয়া মাঝে মাঝে যখন বিশ্রাম করিবে, তখন অনায়াসে ইহাঁদের সহিত কথা বলিতে পারিব।

ছত্রসিংহ। এ বেশ ফন্দি হইয়াছে। ঐ দেখ, নাদেরালি চারি খানা পাল্কী লইয়া আসিয়াছে।

এই সময় নাদেরালি সিপাহী চারিখানা পাল্কী এবং বিশ পঁচিশ জন বেহারা সহ আসিয়া উপস্থিত হইল। নবাব সুজাউদ্দৌলা হাফেজ রহমতের স্ত্রী ও কন্যাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ কালে, তাহাদিগকে হুকুম করিয়াছিলেন, যে, হাফেজের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে পাল্কীতে করিয়া আনিতে হইবে। সৈন্যদিগকে আরও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, যে, তাহাদিগকে কখন বিবস্ত্র করিয়া, তাহাদিগের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে, তিনি তাহার প্রাণ দণ্ড করিবেন। সুজাউদ্দৌলার এইরূপ আদেশ করিবার বিশেষ কারণ ছিল। সুজাউদ্দৌলার মাতা সায়দ উন্নিসা বেগম দিল্লীর অতি সম্রান্ত উমরা সাদাত্‌ আলি খাঁর কন্যা। উক্ত সাদতালির পরিবারের কোন এক রমণীর সহিত হাফেজের কোন এক পুত্র কি পৌত্রের বিবাহ হইয়াছিল।

ইতাতে অযোধ্যার উজীর এবং কোন কোন রোহিলা মহিলার মধ্যে আত্মীয় কুটুম্বিতা ছিল।

নাদেরালি পাল্কী সহ উপস্থিত হইলে পর টম্‌সন্ সাহেব হাফেজ রহমতের কন্যাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"O! the young lady is crying. What a handsome girl she is. I wish Nabab would make her over to me." এ যুবতী কাঁদিতেছে। কি পরমাসুন্দরী যুবতী। নবাব ইহাকে আমাকে দেয় তবে বড়ই ভাল হয়।

এই বলিয়া দুর্বৃত্ত টম্‌সন্ হাফেজের কন্যার গাত্রস্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে, হাফেজের স্ত্রী তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত তরবারি উত্তোলন করিলেন। এদিকে পশ্চাৎ হইতে মেল্‌বিল্ টম্‌সন্‌কে ধরিয়া বলিল,"What are you doing? What are you doing? The Nabab will certainly put us to death. He has given us strict order not to touch the body of any of these ladies" তুমি কি করিতেছ—তুমি কি করিতেছ? নবাব আমাদের প্রাণদণ্ড করিবেন। নবাব ইহাদিগের গাত্রস্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইহার পর নাদেরালি হাফেজের স্ত্রী কন্যা এবং অন্যান্য চারি পাঁচ জন স্ত্রীলোককে পাল্কী আরোহণ করিতে বলিল। কন্যার সহিত পথে কথা বার্ত্তা বলিবেন এই অভিপ্রায়ে, হাফেজের স্ত্রী কন্যার হাত ধরিয়া এক পাল্কীতে উঠিলেন। সৈন্যগণ অনেকেই পাল্কীর অগ্রে অগ্রে চলিল। কেবল অমর সিংহ এবং ছত্র সিংহকে পাল্কীর পশ্চাতে যাইতে দেখিয়া, লেফটেন্যান্ট টম্‌সন ইহাদিগকে পাল্কীর পাহারায় নিযুক্ত করিলেন। অমর সিংহ যাহা আশা করিয়াছিল তাহাই হইল।

* পক্ষপাতী ইংরাজ ইতিহাস লেখক বলেন রোহিলা যুদ্ধের পর রোহিলা রমণী দিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হয় নাই। হাফেজের স্ত্রী এবং কন্যাকে পাল্কীতে করিয়া নিয়াছিল। কিন্তু পরাজিত শত্রুর স্ত্রী কন্যাকে ধৃত করাও কি অত্যাচার নহে? আর রোহিলখণ্ডের অন্যান্য লোকের স্ত্রীলোকদিগকে বিবস্ত্রাবস্থায় যে সুজাউদ্দৌলার নিকট ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা কি সত্য নহে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

পথে পথে

অমরসিংহ হিন্দি কিম্বা উর্দ্দু ভাষাতে শুদ্ধরূপে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিত না; এবং লক্ষ্ণৌ প্রদেশের হিন্দি কি উর্দ্দু সম্যক্ রূপে বুঝিতেও পারিত না। অমরসিংহের পিতা নেহালসিংহের বাড়ী প্রয়াগে (আলাহাবাদে) ছিল। নেহালসিংহের পুত্র যে হিন্দি কি উর্দ্দু বুঝিতে পারেনা, এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে রেজিমেণ্টের মধ্যে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইত। কেহ কেহ বলিত, মুর্শিদাবাদে নেহাল সিংহের একটা বাঙ্গালি মেয়ের সঙ্গে আসক্তি ছিল। সেই বাঙ্গালি স্ত্রীলোকটার গর্ভে অমরসিংহের জন্ম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিত, নেহালসিংহ সেরূপ লোক ছিলেন না। তিনি বড় ধার্ম্মিক লোক, বড় শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কি এই রূপ কোন চরিত্র দোষ ছিল? অমরসিংহ তাঁহার পালিত পুত্র হইবে। এরফান্‌আলি প্রভৃতি বলিত, "নেহালসিংহের জামাতা, রণবীর সিংহ পলাশীর যুদ্ধে নিহত হইলে পর, নেহালসিংহ গোপনে তাঁহার কন্যাকে অমরসিংহের সঙ্গে নিকা দিয়াছে। এই কথা প্রকাশ হইলে তাহার জাতি নষ্ট হইবে, সেই জন্য অমরসিংহকে আপন পুত্র বলিয়া গৃহে রাখিয়াছিল। আসল কথা অমরসিংহ নেহালসিংহের জামাতা।"

এরফান্ আলির এই রূপ বলিবার আর কোন কারণ ছিলনা। অমরসিংহ নেহালসিংহের কন্যাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত, সেই জন্য এরফান্ আলি এই রূপ বলিত। কিন্তু এ সংসারে যাহার যেরূপ চক্ষু সে অপরকে সেই ভাবে দেখে। চোর মনে করে, যে জগতের সমুদয় লোকই চোর। সাধু মনে করেন, যে পৃথিবীর সকল লোকই সাধু। এরফান আলি যেরূপ লোক তাহার মনের ভাব তদনুরূপই হইবে। ইহাতে আমরা এরফান্‌আলিকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারি না।

অমরসিংহের পরিচয় পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন। এই স্থানে সে সকল বিষয় উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। হাফেজের পত্নীর সঙ্গে তাঁহার রাস্তায় যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহাই কেবল এই অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

সিপাহীগণ অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। হাফেজের পরিবারস্থ আট নয় জন স্ত্রীলোক পাল্কী আরোহণে তাঁহাদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছে। ছত্রসিংহ এবং অমরসিংহ পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। অপরাহ্নে ইহারা হাফেজের গৃহ হইতে বাহির হইয়াছে। এখন প্রায় বেলাবসান হইয়া আসিয়াছে। রাত্রে ইহাদিগকে নিকটস্থ কোন এক বাজারে অবস্থান করিতে হইবে। বেলা দুই দণ্ড থাকিতে ইহারা এক বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

লেফটেন্যাণ্ট টমসন বলিলেন, এখন অনেক বেলা আছে। এ বাজার ছাড়িয়া সম্মুখস্থ আড্ডায় যাইয়া রাত্রে অবস্থান করিব।

কিন্তু পাল্কী বেহারাগণ এই বাজারে পৌঁছিয়াই বৃক্ষতলে পাল্কী রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছে। তাহারা বলিতেছে "হুজুর অন্ধকার রাত্রি, পাল্কী লইয়া আর চলিতে পারিব না।"

লেফটেন্যাণ্ট টমসন স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে, হাতের চাবুক দ্বারা দুইতিনটা পাল্কী বেহারার পৃষ্ঠের উপর আঘাত করিলেন। এ চাবুকাঘাত প্রহার করিবার অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হয় নাই। তবে ইংরাজের হাতের আঘাত, ইহাতে দুর্ব্বল বেহারাদিগের পৃষ্ঠ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। বেহারাগণ ভয়ে ও ত্রাসে এদিক ওদিক দৌড়িয়া আত্মরক্ষা করিল। টম্‌সন্ এবং টম্‌কিন্ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বালক বালিকাগণ পশুপক্ষীর গাত্রে যষ্টি দ্বারা আঘাত করিয়া যেরূপ খেলা করে, ইহারাও সেই প্রকার একটা খেলা করিলেন। কৃষ্ণবর্ণ পাল্কী বেহারাগণ সাহেবদিগের নিকট অমন প্রকার ক্রীড়ার সামগ্রী বই আর কি।

হইলে তিনি নিশ্চয়ই ... কন্যা যে পাল্কীর মধ্যে বসিয়া ছিলেন, অমরসিংহ চার দর্শনে একবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিয়া আছেন। পাল্কীর দরজা রুদ্ধ উজীরকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেন।" ...ই ভাবিতেছেন।

হাফেজ পত্নীর মুখকমল তখন একটু প্রফুল্ল হইল। ...সিংহ পাল্কীর দরজার অনায়াসে যুদ্ধাবসানে ফায়েজউল্লার সহিত পলায়ন করিতে ...কোন বিষয়ের কিন্তু স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন না করিয়া রোহিলখণ্ড পরি... লোক করিবেন না বলিয়া সে দিন পলায়ন করেন নাই। পথে তাহার ...দর কনিষ্ঠ পুত্র নবাব সৈন্য কর্তৃক ধৃত হইল। সুতরাং পলায়নের আর সুবিধা

পাল্কীর মধ্য হইতে ছত্রসিংহের কথায় কেহ কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। কেবল দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনা গেল।

অমরসিংহের শিক্ষানুসারে ছত্রসিংহ আবার বলিল, "মা, আমার সঙ্গে যে এই আর একটি সিপাহী আছেন, ইহার নাম অমরসিংহ। গ্রাম লুট করিবার সময় ইনি অনেকানেক রোহিলারমণীকে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আপনাদিগকে কোন প্রকার কষ্ট প্রদান করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। তবে আমরা চাকর, মনিবের হুকুম আমাদিগকে মান্য করিতে হয়, তাই আপনাদিগকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আমাদের দ্বারা যদি আপনাদের কোন বিষয়ের সাহায্য হয় তবে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তাহা করিব।"

ইংরাজদিগের সৈন্যের মধ্যে একজন সিপাহী গ্রাম লুট করিবার সময় যে অনেকানেক রোহিলারমণীকে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে হাফেজের পত্নী লোক পরম্পরায় শুনিয়াছেন। সুতরাং তিনি অমরসিংহের নাম শুনিয়া পাল্কীর দ্বার অল্প একটু খুলিবামাত্র সম্মুখে চাহিয়া দেখেন, যে তাহাদিগকে ধৃত করিবার সময় যে সিপাহী তাহাদিগের প্রকোষ্ঠে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল এবং স্বপ্নাবস্থাপন্ন লোকের ন্যায় একবার মা মা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকেই ছত্রসিংহ অমর সিংহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। এখন ইহাদিগের সঙ্গে কথা বলিতে হাফেজের স্ত্রীর সাহস হইল। তিনি ছত্রসিংহের কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "বিপন্নদিগকে যাঁহারা সাহায্য করেন,পরমেশ্বর তাঁহাদিগের মঙ্গল করিবেন।"

ছত্রসিংহ পূর্ব্বের ন্যায় আবার অমরসিংহের শিক্ষানুসারে বলিল, "মা তোমাকে আমরা আপন গর্ভধারিণীর ন্যায় মনে করি। নরপিশাচ স্বভাবে উদ্দৌলার হস্ত হইতে তোমাকে এবং তোমার কন্যাকে ... চোর। সাধু মনে র্জ্জন করিয়াও রক্ষা করিতে চেষ্টা করি সাধু। এরফান আলি যেরূপ লোক পলায়নের সুবিধা করিয়া ...রূপই হইবে। ইহাতে আমরা এরফান্ আলিকে

ছত্রসিংহ এই ব্যস্ত করিতে পারি না।

একবারে খুলি...হের পরিচয় পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন। এই স্থানে কথন কি...কিল বিষয় উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। হাফেজের পত্নীর আ...সঙ্গে তাঁহার রাস্তায় যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহাই কেবল এই অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

হাফেজের স্ত্রী বলিলেন,—"আমাদের পলায়নের সাধ্য নাই। দেশের সর্ব্বত্রই বিপক্ষ সৈন্যগণ বিচরণ করিতেছে। পলায়নের চেষ্টা করিলে সেই মুহূর্ত্তেই ধরা পড়িব।"

ছত্রসিংহ। (অমরসিংহের শিক্ষানুসারে) তবে আপনাদিগের উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই? আপনাদিগের উদ্ধারার্থ আমাদিগকে যাহা কিছু করিতে বলিবেন তাহাই করিব। প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও আপনাদের মান সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা করিব।

হাফেজের পত্নী এই কথা শুনিয়া উর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক রোহিলাভাষায় বলিলেন—"হে পরমেশ্বর তোমার সৃষ্টি মানুষ বিপদে পড়িয়া যখন একেবারে আশা শূন্য হয়, তখন তুমি আপন দূত প্রেরণ করিয়া বোধ হয় তাহাদিগকে সান্ত্বনা কর। নহিলে বিপক্ষের সৈন্য কেন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া আমাদিগের উদ্ধারের চেষ্টা করিবে।"

তৎপর ছত্রসিংহকে সম্বোধন পূর্ব্বক তিনি বলিলেন—"বাছা! আমাদিগের এই ঘোর বিপদের সময় যে তোমরা এইরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিলে, ইহাতে পরমেশ্বর অবশ্য তোমাদিগের মঙ্গল করিবেন। কিন্তু এখন মৃত্যু ভিন্ন আর আমাদের উদ্ধারের কোন উপায় দেখিনা। তোমরা আমাদের উদ্ধারার্থ বৃথা চেষ্টা করিয়া কেন অনর্থক বিপদ পড়িবে। মৃত্যুর ঔষধ আমাদের সঙ্গেই আছে। যদি উজীর আমাদের ইজ্জাৎ নষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তবে তখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া আপন আপন ইজ্জাৎ এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিব।"

ছত্রসিংহ বলিলেন,—"আপনারা নিরাশ হইবেন না। আমার সঙ্গী এই অমরসিংহ বলিতেছেন, যে উজীর আপনাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে তিনি নিশ্চয়ই উজীরের প্রাণবধ করিবেন। ইনি উজিরের অত্যাচার দর্শনে একবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন। এখন সুযোগ পাইলেই উজীরকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেন।"

হাফেজ পত্নীর মুখকমল তখন একটু প্রফুল্ল হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে যুদ্ধাবসানে ফায়েজউল্লার সহিত পলায়ন করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন না করিয়া রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করিবেন না বলিয়া সে দিন পলায়ন করেন নাই। পথে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র নবাব সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত হইল। সুতরাং পলায়নের আর সুবিধা

হইল না। এখন মনে করিলে আত্মহত্যা করিয়া অনায়াসে সকল কষ্ট দূর করিতে পারেন। কিন্তু স্বামীর শত্রুকে বিনাশ না করিয়া আত্মহত্যা করিবেন না। স্বামীর শত্রুকে বিনাশ করিবেন বলিয়া স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এ জীবনে স্বামীর শত্রু বিনাশ ভিন্ন আর তাঁহার কোন কার্য্য নাই, কিন্তু এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধনার্থ যে কাহারও সাহায্য পাইবেন তাহার আশা ছিলনা। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার লোকও মিলিল। এখন তাঁহার আশা আরো দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি সমুৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বাছা! তুমি কিরূপে উজীরের প্রাণবিনাশ করিবে?"

ছত্রসিংহ। (অমরসিংহকে নির্দ্দেশ করিয়া) ইনি বলিতেছেন যে, কিরূপে উজীরের প্রাণ বিনাশ করিবেন তাহা এখন অবধারণ করিবার সাধ্য নাই। অবস্থানুসারে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

হাফেজের স্ত্রী মনে মনে বলিলেন, আমিও তাহাই ঠিক করিয়াছি। উজীরের গৃহে প্রবেশ করিবার পর অবস্থানুসারে তাহার বিনাশের চেষ্টা ভিন্ন পূর্ব্বে কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় অবধারণ করা যাইতে পারে না। কারণ আমরা এখন কয়েদ অবস্থায় আছি। আমাদের কোন স্বাধীনতা নাই। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন,—"যিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক উৎপত্তি করিতে পারেন এবং সহস্র সহস্র লোক বিনাশ করিতে পারেন, তিনি এই দুষ্টকে দমন করিবার সুযোগ তোমাকে নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন।"

ইহার পর ছত্রসিংহ বলিল,—"আপনারা এই অমর সিংহকে চিনিয়া রাখিবেন। ইহার চেহারা ভুলিবেন না। ইনি বলিতেছেন, গোপনে আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শত্রু বিনাশের কোন উপায় করিবেন।"

এই সকল কথাবার্ত্তার পর বেহারাগণ আসিয়া পাল্কী বাজারের একখানা ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। লেফটেন্যাণ্ট টম্‌সন্ এই স্ত্রীলোকদিগের রাত্রে অবস্থানার্থ সেই ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। হাফেজের পত্নীর সঙ্গিনী স্ত্রীলোকেরাও সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।
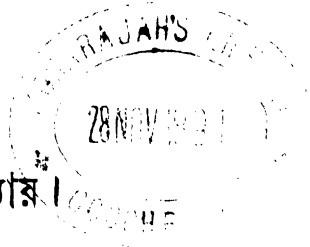
সপ্তম অধ্যায়।

পূর্ব্ব কাপুরুষতা।

ছত্রসিংহ এবং অমর সিংহ বাজারের মধ্যে অন্য একখানি গৃহে প্রবেশ করিয়া আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। ছত্রসিংহ ব্রাহ্মণ। নেহাল সিংহও ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং নেহালসিংহের পুত্র অমরসিংহের সহিত ছত্রসিংহের একত্রে আহারাদি করিবার কোন বাধা ছিলনা।

আহারান্তে ছত্রসিংহ অমর সিংহকে বলিল "ভাই তুমি কি সত্য সত্যই উজীরের প্রাণ বিনাশ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছ? তুমি পাগল হইলে নাকি?"

অমর সিংহ। উজীর শত শত রোহিলা রমণীর প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেছে। আমি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, উজিরের প্রাণবধ করিয়া আমার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। জগত অত্যাচারী শূন্য করিব।

ছত্রসিংহ। তুমি পূর্ব্বে কি পাপ করিয়াছিলে? তুমি তো তোমার পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক। নেহাল সিংহ কখনও কাহারও অনিষ্ট করেন নাই। তুমিও কখনও কাহারও অনিষ্ট কর না। তোমার আবার পাপ কি?

অমরসিংহ। ভাই মানুষের পাপের অভাব নাই। আমরা সকলেই পাপী। কিন্তু সে সকল কথায় প্রয়োজন নাই। তোমাকে যাহা বলিতেছি শুন। উজীরের প্রাণ বিনাশ করিলে আমাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। আগামী কল্য কি তৎপর দিবস আমরা বিশুলি পৌছিব। হয়তো বিশুলি পৌছিবার অব্যবহিত পরেই আমার এই ব্রত পালন করিতে হইবে। সুতরাং আর অনেক দিন আমাকে এ সংসারে থাকিতে হইবে না। তোমাকে যাহা কিছু বলিয়া যাইতে হইবে, তাহা এখনই বলিতেছি। তোমাকে আমার মৃত্যুর পর এই সকল কার্য্য করিতে হইবে।

ছত্রসিংহ। তুমি নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছ। কেন তুমি এই রূপে

আপন প্রাণটা দিবে। তুমি মরিয়া গেলে তোমার বিধবা ভগ্নীকে কে প্রতিপালন করিবে? নেহাল সিংহ মৃত্যুকালে তাঁহাকে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

অমরসিংহ। সেই সম্বন্ধেই তোমার নিকট কয়েকটী কথা বলিয়া যাইব। আমি এ প্রাণ নিশ্চয়ই বিসর্জ্জন করিয়া, আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

ছত্রসিংহ। তুমি কি পাপ করিয়াছিলে বলদেখি?

অমরসিংহ। ভাই তোমরা সকলেই জান, যে, আমি নেহাল সিংহের পুত্র। কিন্তু নেহাল সিংহ আমার পিতা নহেন। তিনি আমার এক প্রকার জীবন দাতা। সতের বৎসর বয়েসের সময় আমি আত্মহত্যা করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলাম। নেহাল সিংহ অচৈতন্যাবস্থায় আমাকে নদী হইতে তুলিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিলেন। পরে পুত্রের ন্যায় আমাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন; এবং অস্ত্র বিদ্যা শিখাইলেন। সেই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আমি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছি। গঙ্গায় ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে আমি ন্যায় দর্শন ইত্যাদি সকল শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। কিন্তু শাস্ত্র অধ্যয়নে কোন উপকারই হয় নাই। সে কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমি মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারি নাই। নবাব মীর জাফরের পুত্র দুর্ব্বৃত্ত মীরণের প্রেরিত চার পাঁচ জন লোক আসিয়া, আমার মাতা, স্ত্রী এবং ভগ্নীকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া লইয়া চলিল। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমার সাহস হইল না, যে সেই পাঁচ জন লোকের প্রাণ বধ করিয়া, আপন জননী স্ত্রী এবং ভগ্নীকে রক্ষা করি। আমি তখন নিজে প্রাণের ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলাম। আমার জননী কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ধৃতকারি লোকদিগের চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন "বাছা! আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা—আমাদিগের জাতি নষ্ট করিও না।" কিন্তু ইহাতেও আমি একবার অগ্রসর হইয়া সেই ধৃতকারি পিশাচদিগের দণ্ড বিধানের চেষ্টা করিলাম না। ভয়ে ও ত্রাসে আমার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। ধিক্ এজীবনে! ধিক্ এজীবনে! হায় হায়! জননীর সেই ক্রন্দনধ্বনি এখনও আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্রই অমরসিংহ শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ছত্রসিংহ তাঁহাকে চেতন করিবার নিমিত্ত তাহার মস্তকে জল ঢালিতে লাগিল।

কিছুকাল পরে অমর সিংহ চৈতন্য লাভ করিয়া, আবার বলিতে লাগিল, "ভাই ন্যায় দর্শন অধ্যয়ন কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা মানুষের কাপুরুষতা বিনাশ হয় না, মানুষের মনের নীচাশয়তা দূর হয় না। এখন একশত লোক আসিয়া যদি আমার সাক্ষাতে কোন নিরাশ্রয় রমণীকে আক্রমণ করে, আমি তৎক্ষণাৎ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে পারি। প্রাণ দাতা এবং অস্ত্র গুরু নেহাল সিংহ অস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই আমার সেই পূর্ব্ব কাপুরুষতা এবং নীচাশয়তা দূর হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়াছেন, "পরোপকারার্থ মানুষের প্রাণ বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য"। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে যে ব্যক্তি কখনও শিক্ষা করে নাই, অথবা সংগ্রাম ক্ষেত্রে কিম্বা জীবনের অন্য কোন ঘটনা উপলক্ষে দুই চারি বার যে ব্যক্তি জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হয় নাই, সে কি সেই শাস্ত্র প্রণেতাদিগের পুস্তক পাঠ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে ?

"নরপিশাচগণ যখন আমার জননী, স্ত্রী এবং ভগ্নীকে হরণ করিল, তখন কোন শাস্ত্রই আমার অবিদিত ছিল না। তৎপূর্ব্বে পিতার নিকট ন্যায়, দর্শন, সাহিত্য, বেদ বেদান্ত সকলই অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। কত লোককে উপদেশ প্রদান করিতাম যে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াও পরোপকার করিবে। কিন্তু কার্য্যকালে আমি নিজে কি করিলাম ? পরোপকারের কথা তো দূরে থাকুক, যে গর্ভধারিণী দশ মাস দশ দিন আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার স্তন্য দুগ্ধ এই শরীরকে পোষণ করিয়াছে; যিনি প্রাণ দিয়াও আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন; যাঁহার বক্ষ আমার বাল্যকালের এক মাত্র শয্যা ছিল; হায় হায় তাঁহার প্রতি নরপিশাচগণ যখন অত্যাচার করিতেছিল, তখন আমি এক পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে একবার ধরিলাম না। অত্যাচারিদিগের গাত্র স্পর্শ করিতে আমার সাহস হইল না। আমি তখন আপন প্রাণ রক্ষার্থ মনে মনে পলায়নের চিন্তা করিলাম। ধিক্ এ জীবনে! ধিক্ এ জীবনে!"

এই বলিয়াই অমর সিংহ দণ্ডায়মান হইল। কটিদেশ হইত অসি বাহির করিয়া উত্তোলন পূর্ব্বক ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিয়া উঠিল,—"জননী, তোমার

যে কুপুত্র কাপুরুষতা নিবন্ধন নরপিশাচের হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করিতেও বিরত ছিল, আজ সে মুসলমান বালা হাফেজ নন্দিনীর ধর্ম্ম রক্ষার্থ এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।”

অমর সিংহের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ছত্র সিংহ নির্ব্বাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অমর সিংহও কিছু কাল নির্ব্বাক রহিল।

কিছু কাল পরে ছত্র সিংহ জিজ্ঞাসা করিল “নেহাল সিংহের সঙ্গে তোমার কিরূপে সাক্ষাৎ হইল?”

অমর সিংহ বলিল, “ভাই সে আবার আর এক প্রকারের কাপুরুষতার কথা। জননীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু এই ঘটনার পর দিন লোক গঞ্জনার ভয়ে আমি আমার পিতা এবং আমার ভগ্নীপতি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলাম। দেশীয় লোকে আমাদিগকে জাতি ভ্রষ্ট করিবে, দেশীয় লোকে আমাদিগকে উপহাস করিবে, এই ভাবনাই আমাদিগকে অস্থির করিল! হায় হায় কাপুরুষ বাঙ্গালির প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই কেবল কাপুরুষতা পরিলক্ষিত হয়। ধিক বাঙ্গালী! ধিক বাঙ্গালী! ভাই আমি আমার পিতা এবং আমার ভগ্নীপতি তিন জনই আত্মহত্যা করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলাম। নেহাল সিংহের মুখে শুনিয়াছি তিনি গঙ্গায় স্নান করিতে যাইয়া চরের উপর আমার এবং আমার ভগ্নীপতির শরীর দেখিতে পাইলেন। আমার ভগ্নীপতির জীবন একেবারে নিঃশেষিত হইয়াছিল। শত চেষ্টা করিয়াও নেহালসিংহ তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। আমি মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়াছিলাম। অনেক যত্ন ও পরিশ্রমে তিনি আমাকে পুনর্জীবিত করিলেন। আমি চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলাম নেহালসিংহ এবং অন্যান্য অনেক লোক আমার চতুঃপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমার ভগ্নীপতির মৃতদেহ আমার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে।”

ছত্রসিংহ। তোমার পিতার মৃতদেহ পাওয়া গেল না?

অমরসিংহ। তাঁহারও বোধ হয় মৃত্যু হইয়া থাকিবে। তাঁহার মৃতদেহ কোথাও পাওয়া গেল না।

ছত্রসিংহ। তোমার মাতা ভগ্নী এবং স্ত্রীর পরে কি হইল, তাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলে?

অমরসিংহ। তাঁহারাও বোধ হয় আত্মহত্যা করিয়া থাকিবেন।

আমার পিতা নবাব বাড়ীর একজন বাঁদীকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া, তাহার দ্বারা জননীকে কন্যা ও পুত্রবধূ সহ আত্মহত্যা করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

ছত্রসিংহ। ইহার পর নেহালসিংহ কি তোমাকে সঙ্গে করিয়া আপন বাড়ীতে লইয়া গেল?

অমরসিংহ। নেহালসিংহ ইংরাজদের কাসিমবাজারের কুঠীতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার রেসালা* সহ তাঁহাকে কলিকাতা যাইবার হুকুম হইলে, তিনি নৌকাপথে কলিকাতা যাইতেছিলেন। তাঁহার কলিকাতা যাইবার সময়ে তিনি আমাকে নদী হইতে উঠাইলেন। আমার চৈতন্য হইবামাত্র আমাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

ছত্রসিংহ। তোমার বাড়ী কি মুর্শিদাবাদে ছিল।

অমরসিংহ। না। ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুর। আমরা বেলপুকুরের ভট্টাচার্য্য। আমাদের গুরুত্ব ব্যবসা ছিল। আমার প্রকৃত নাম ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য। আমি বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পুত্র। আমরা সপরিবারে গঙ্গাস্নান করিতে মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলাম; তাহাতে এই বিপদ উপস্থিত হইল।

ছত্রসিংহ। তবে তুমি নিশ্চয়ই সুজাউদ্দৌলাকে খুন করিতে চেষ্টা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছ?

অমরসিংহ। আমি নিশ্চয়ই উজীরের প্রাণ নষ্ট করিব। হাফেজ নন্দিনীর মুখ খানি ঠিক আমার ভগ্নীর মুখখানির ন্যায়। তাহাকে দেখিবামাত্রই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, ইহার ধর্ম্ম রক্ষার্থ আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। এ সদনুষ্ঠান হইতে আমাকে কেহ বিরত রাখিতে পারিবে না। কিন্তু আমি মরিলে ভগ্নী চাঁদকুমারীর কি উপায় হইবে, তাহাই কেবল ভাবিতেছি। কে তাঁহাকে ভরণপোষণ করিবে? পিতা নেহালসিংহ মৃত্যুকালে তাঁহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। নেহালসিংহের গৃহে অবস্থান কালে আহারের সময়ে মাতৃরূপে তিনি আমার নিকটে বসিয়া আমাকে আহার করাইতেন; জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় সর্ব্বদা আমাকে স্নেহ করেন। আমার মৃত্যু হইলে আমার শোকে তিনি বড়ই কষ্ট পাইবেন। তাঁহার এবং তাঁহার পুত্রের ভরণপোষণেরও কোন উপায় থাকিবে না।

* এক এক সুবাদারের অধীনস্থ সৈন্যদলকে রেসালা বলা যায়।

ছত্রসিংহ। রণবীরসিংহের মৃত্যুর পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কি তাঁহার স্ত্রী চাঁদ কুমারীর ভরণপোষণার্থ কিছু অর্থ প্রদান করেন নাই?

অমরসিংহ। ভাই, সে কথা মনে হইলে আর এই অকৃতজ্ঞ স্বার্থ পরায়ণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি করিতে ইচ্ছা হয় না। ওদের একটা ফিরিঙ্গি যুদ্ধে মরিলেই তাহার স্ত্রী পুত্রের চিরকালের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে। কিন্তু একটা এ দেশীয় সিপাহী সংগ্রাম ক্ষেত্রে ইহাদের উপকারার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে, তাহার স্ত্রী পুত্রকে শ্রাদ্ধের ভিক্ষা স্বরূপ দশ পাঁচ টাকার অধিক কখন প্রদান করে না। রণবীর সিংহকে আমি দেখি নাই। কিন্তু তোমাদের সকলের মুখেই তো শুনিতে পাই, যে পলাশীর যুদ্ধে সে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল।

ছত্রসিংহ। ভাই পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে আমিও উপস্থিত ছিলাম। আমি স্বচক্ষে সকল দেখিয়াছি। সে দিন রণবীরসিংহ না থাকিলে বড় বিপদ উপস্থিত হইত। রণবীরসিংহের হাতেই মীরমদনের মৃত্যু হয়। মীরমদনের মৃত্যুর পরই বিপক্ষ সৈন্যদিগকে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে সিরাজউদ্দৌলা আদেশ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নবাবের সেনাপতি মোহনলালের হাতে রণবীরের মৃত্যু হইল। এ বড় অন্যায় যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রণবীরসিংহের স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণের কোন বন্দোবস্ত করে নাই।

অমরসিংহ। ভাই আমার সঙ্গেই আমার দুই তিন হাজার টাকা আছে। লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়াই সেই টাকা তোমার নিকট দিব। আমার মৃত্যুর পর প্রয়াগে যাইয়া তুমি এই টাকা এবং আমার একখানা পত্র ভগ্নী চাঁদকুমারীকে দিবে। আর তাহার পুত্র মহাবীর সিংহকে তুমি সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দিবে। চাঁদকুমারীর অত্যধিক সন্তান বৎসলতা মহাবীরের সর্ব্বনাশ করিবে। সংগ্রামক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া, চাঁদকুমারী প্রাণান্তেও আপন পুত্র মহাবীরকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে চাহেন না। রণবীর সিংহের মৃত্যু কালে তাঁহার পুত্র দুইমাসের শিশু ছিল। তাহার যখন দুই তিন বৎসর বয়স হইয়াছে, তখন আমি নেহাল সিংহের গৃহে অবস্থান করিতে আরম্ভ করি। এক দিন নেহালসিংহ আমাকে বলিলেন, "বাবা তুমিতো অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছ; আমার এই দৌহিত্রের একটা ভাল নাম নির্ব্বাচন কর দেখি।" আমি বড় আহ্লাদের সহিত রণবীর

সিংহের পুত্রের নাম মহাবীর সিংহ রাখিলাম। মহাবীর অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিলে এত দিনে প্রকৃত মহাবীর বলিয়া পরিচিত হইতেন। কিন্তু দিদি চাঁদ কুমারী একেবারে তাহার পরকাল নষ্ট করিতেছেন। মহাবীরের বয়ঃক্রম এখন প্রায় সতের আঠার বৎসর হইয়াছে। মহাবীর নেহালসিংহের দৌহিত্র এবং রণবীরসিংহের পুত্র। সে প্রার্থনা করিলে এখনই সাহেবেরা তাহাকে সিপাহীর কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু তাহাকে সংগ্রামক্ষেত্রে পাঠাই-বার কথা বলিলেই, দিদি চাঁদকুমারী রণবীর সিংহের শোকে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করেন। আমি তখন আর কিছুই বলিতে পারি না। চাঁদকুমারীর ইচ্ছা যে তাহার পুত্র শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া কোন রাজ-সরকারে রাজস্ব আদায়ের কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

ছত্রসিংহ। সে কি শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে?

অমরসিংহ। আমার নিকটই শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছে। কিন্তু তাহার নিজের অস্ত্রশিক্ষার প্রতিই বিশেষ রুচি দেখা যায়। সাংগ্রামিক জীবনই সে ভাল বাসে।

ছত্রসিংহ। তুমি কি মনে কর যে শাস্ত্র পাঠ করা ভাল নয়? কেবল যুদ্ধ করিতে শিখিলেই ভাল হয়?

অমরসিংহ। আমি তো বরাবরই বলিতেছি যে, কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা মানুষের কাপুরুষতা এবং নীচাশয়তা দূর হয় না। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যে, পরোপকারার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সত্য সত্যই আপন জীবনবিসর্জ্জন করিতে কখনও প্রস্তুত হয় না, সে কি কখন জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে? যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রবেশ ভিন্ন মানুষ কখনও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না।—"এই অনিত্য দেহ অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ—পরোপকারার্থ এই অনিত্য দেহ বিসর্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য,"—শাস্ত্রে এই সকল কথা পাঠ করিয়া আমাদের একটী নূতন রোগ উপস্থিত হয়। তখন কেবল অপরের জীবনের উপর আমাদের দৃষ্টি পড়ে। পৃথিবীর অন্যান্য লোক কেন শাস্ত্র পালন করে না, অন্যান্য লোক কেন পরোপকারার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করে না; অন্যান্য লোক কেন স্বার্থপরতা ত্যাগ করেনা; তজ্জন্য আমরা তাহাদিগকে কেবল নিন্দা করিতে থাকি। কিন্তু নিজে যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে অসমর্থ, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। পক্ষান্তরে সংগ্রামক্ষেত্রে দুই তিন বার

প্রাণবির্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইলে, মানুষ অকুতোভয় হইয়া শাস্ত্রের বাক্য পালন করিতে সমর্থ হয়।

ছত্রসিংহ। তবে কি মহাবীর সিংহকে একান্তই সিপাহীর কার্য্যে নিযুক্ত করাইয়া দিতে হইবে?

আমরসিংহ। আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার প্রদত্ত টাকা এবং এক খানা পত্র লইয়া প্রয়াগে (আলাহাবাদ) চাঁদকুমারীর নিকট চলিয়া যাইবে। তাঁহাকে আমার মৃত্যু বিবরণ বলিবে। অন্যান্য সকল বিষয়ই আমি পত্রের মধ্যে লিখিয়া রাখিয়া যাইব। আর একটী কথা মনে রাখিবে—সুজা-উদ্দৌলার প্রাণ বিনাশ করিয়া যদি আমি পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই আমি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সৈন্যভুক্ত হইব। তাহা হইলে আমি আর এদেশে আসিতে পারিব না। তুমি তখন দিদি চাঁদকুমারী এবং মহাবীর সিংহকে হলকারের রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। উঁহারা এখন নেহালসিংহের বৃদ্ধা জননীর সঙ্গে প্রয়াগে নেহাল সিংহের পৈত্রিক বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন।

ছত্রসিংহ। চাঁদকুমারীর নিকট যে পত্র দিবে তাহাও কি এখনই লিখিয়া রাখিবে?

অমরসিংহ। এখনই লিখিব বই কি। আমরা কল্যই বিশুলি* তাঁবুতে পৌঁছিব। যদি পৌঁছিবামাত্র, নবাবের প্রাণ বিনাশের সুযোগ হয়, তবে কি আর আমি বিলম্ব করিব? যাহা হয় সমুদয় বন্দোবস্ত আজ রাত্রেই করিতে হইবে।

ছত্রসিংহ। তবে তুমি পত্র লিখিতে আরম্ভ কর। আমি আর এক কল্কী গাঁজার যোগাড় করি। অনেক রাত্রি হইয়াছে। আর একবার গাঁজা না খাইলে আর ঘুম হইবে না।

অমরসিংহ। ভাই তুমি এখন বুড়া হইয়াছ। গাঁজার অভ্যাসটা ছাড়িয়া দিতে পার? আমার এই শেষ অনুরোধটী রক্ষা কর।

ছত্রসিংহ। ভাই তোর অনুরোধে আমি প্রাণ দিতে পারি। কিন্তু গাঁজা ছাড়িতে পারিব না।

অমরসিংহ। (সজল নয়নে) আমি তোমার পায়ে পড়িয়া বলিতেছি

---

* বিশুলি রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত একটী সহর।

তুমি গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ কর। এই আমার মৃত্যু কালের অনুরোধ।

"মৃত্যু কালের অনুরোধ" এই কথা শুনিয়া ছত্র সিংহের হৃদয় একটু বিগলিত হইল। সে কিছু কাল চিন্তা করিয়া বলিল, "অমর, কাল সকাল হইতে তোমার অনুরোধ রাখিতে চেষ্টা করিব। এ কল্কী প্রস্তুত, এখন একবার খাই।"

এই বলিয়া ছত্রসিংহ গাঁজায় দম দিতে আরম্ভ করিল। অমরসিংহ প্রদীপের নিকট বসিয়া, স্বীয় জ্যেষ্ঠসহোদরা সদৃশী নেহালসিংহের কন্যা চাঁদকুমারীর নিকট পত্র লিখিতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই পত্র লেখা শেষ হইল। তখন ছত্রসিংহ বলিল, "কি লিখিয়াছ একবার পড় দেখি শুনি।"

অমরসিংহ পত্র পাঠ করিতে লাগিল—

"দিদি, এ সংসারে তুমি এবং তোমার পুত্র মহাবীর ভিন্ন আমার আর ভালবাসার কেহ নাই। আমি যাহাদিগকে ভাল বাসিতাম, তাঁহারা সকলেই বোধ হয় এখন পরলোকে আছেন। সেখানে যাইতে পারিলেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত মন সর্ব্বদাই ক্রন্দন করে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আত্মহত্যা ভিন্ন আর পরলোকে যাইবার দ্বিতীয় উপায় ছিল না। কাপুরুষতা নিবন্ধন একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তখন তোমার পিতা আমার জীবন রক্ষা করিলেন। তৎপরে বুঝিতে পারিয়াছি যে, আত্মহত্যা করা অপেক্ষা সংসারে আর গুরুতর কাপুরুষতার কার্য্য কিছুই নাই। সুতরাং আর কখন আত্মহত্যার চেষ্টা করি নাই।

"এখন একটী মহদুদ্দেশ্যে জীবন সমর্পণপূর্ব্বক আমার পরলোকে যাইবার বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এ সুযোগ পরিত্যাগ করিব না।

অতি সচ্চরিত্রা একটী নিরাশ্রয়া নবাব কন্যাকে নরপিশাচের হস্ত হইতে রক্ষার্থ প্রাণবিসর্জ্জন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ইহাতে আমার প্রাণ হারাইবারই অধিক সম্ভব; কিন্তু যদি পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে পারি, তবে অত্যল্পকাল মধ্যেই তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিব। আর যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে আমার প্রেরিত এই দুই হাজার টাকার দ্বারা কয়েক বৎসর জীবিকানির্ব্বাহের চেষ্টা করিবে; এবং অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষার্থ মহাবীরকে এই পত্র বাহক ছত্রসিংহের সঙ্গে রাখিয়া দিবে। অত্যধিক

সন্তান বৎসলতা নিবন্ধন এই পাঁচ সাত বৎসর যাবৎ তুমি মহাবীরের অস্ত্র শিক্ষা সম্বন্ধে বাধা দিতেছ। তুমি মা হইয়া তাহার পরম শত্রুর কার্য্য করিতেছ। অস্ত্র শিক্ষা ভিন্ন মানুষ কখন মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। কাপুরুষতা এবং স্বার্থপরতা চিরকালই মনুষ্যকে পশু প্রকৃতি প্রদান করে। সেই কাপুরুষতা বিনাশের ঔষধ একমাত্র অস্ত্র শিক্ষা। আমার মনে সর্ব্বদাই এই প্রশ্নের উদয় হয়—তুমি বীরের কন্যা, বীরের পত্নী; অস্ত্র শিক্ষার প্রতি তোমার মনে এইরূপ বিদ্বেষের ভাব কেন উপস্থিত হইল? অনেক চিন্তা করিয়া শেষে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, সংসর্গ দোষ হইতে কেহ নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। তিন বৎসর বয়সের সময় তোমার মাতৃ বিয়োগ হইলে পর, তুমি পিতার সঙ্গে বরাবর বঙ্গদেশে ছিলে। বাল্য কালে কাসিমবাজারের নিকটস্থ গ্রামের বাঙ্গালী মেয়েদের সঙ্গে সর্ব্বদা ধূলা খেলা করিতে। যৌবন কালে বাঙ্গালী রমণীগণই তোমার সঙ্গিনী ছিলেন। তোমার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য এবং ব্যবহারে আমি বাঙ্গালী রমণীর ভাব চরিত্র দেখিতে পাই। বাঙ্গালী মেয়েদিগের ন্যায় তোমার অন্তর দয়া ও স্নেহে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালী মেয়েদিগের ন্যায় তুমি অত্যন্ত পতিপ্রাণা এবং পরমাসাধ্বী। বাঙ্গালী মেয়েদিগের ন্যায় তোমার মধ্যে অত্যন্ত ত্যাগ স্বীকারের ভাব পরিলক্ষিত হয়। নিজে আহার না করিয়াও পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নীকে কিরূপে আহার করাইবে, কিরূপে তাহাদিগকে সুখে রাখিবে বাঙ্গালী মেয়েদিগের ন্যায় তাহাই কেবল তোমার চিন্তা। বাঙ্গালী মেয়েদের এই সকল সদ্‌গুণ যে লাভ করিয়াছ সে ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল সদ্‌গুণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী মেয়েদের ভীরুতাও তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে। বাঙ্গালী মেয়েদের অন্যান্য সদ্‌গুণ রক্ষা কর। কিন্তু তাহাদের ভীরুতা পরিহার কর।

"সময়ে সময়ে কলিকাতায় অবস্থান কালে তুমি পতি শোকে অধীরা হইয়া পড়িলে, আমি তোমার নিকট বসিয়া কত কত সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিয়া তোমাকে শুনাইয়াছি। তোমার স্মরণ আছেকি, দশরথ পত্নী সুমিত্রা কি কথা বলিয়া স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণকে রামের সঙ্গে বনে পাঠাইয়াছিলেন? যদি এ সংসারে কেহ মাতার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি সুমিত্রা দেবীকে সর্ব্বাংশে অনুকরণ করুন।

"দিদি, আমি এ জন্মের মত তোমার নিকট হইতে বিদায় হইতেছি।

আমার এই শেষ অনুরোধটী রক্ষা করিবে। মহাবীরের অস্ত্র শিক্ষার বাধা দিবে না। সুমিত্রাদেবীর ন্যায় তুমি মাতার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে যত্ন করিবে। কিরূপে প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে, সে বিষয় সন্তানকে শিক্ষা প্রদান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আত্ম রক্ষার প্রবল বাসনা কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলের হৃদয় মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। কর্ত্তব্য প্রতিপালনার্থ যে সর্ব্বদা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে, পিতা মাতা সন্তানকে কেবল তৎসম্বন্ধেই শিক্ষা প্রদান করিবেন। সংক্ষেপে বলিতেছি, সন্তানকে বাঁচিতে শিখাইতে হইবে না, মরিতে শিখাইবে।

"এ সংসার পরিত্যাগের পর যখন পরলোকে যাইব, তখন যদি দেখিতে পাই যে, সুমিত্রার ন্যায় তুমি মহাবীরকে সহাস্য বদনে কর্ত্তব্য প্রতিপালনার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে বিদায় দিতেছ, তবে আমি পরমানন্দ লাভ করিব। তুমি সুমিত্রার সে কথা কয়েকটি কখনও ভুলিবে না।

"আমি পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, প্রত্যেক জননী সুমিত্রার সেই বাক্য আপন আপন জপ মন্ত্র করুন। তোমার স্মরণার্থ রামায়ণের সে শ্লোক কয়েকটী আবার লিখিয়া দিতেছি। মনে রাখিবে, যে, এ শ্লোকটী তোমার জপ মন্ত্র। এই শ্লোকটীই আমার মৃত্যু কালের দান।—

সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে।
রামে প্রমাদং মাকার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি ॥ * *
ইদংহি বৃত্তমুচিতং কুলস্যাস্য সনাতনম্।
দানং দীক্ষাচ যজ্ঞেষু তনুত্যাগো মৃধেষু হি ॥
রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম।
অযোধ্যা মটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথা সুখম্ ॥

"দিদি, এখন আমাকে বিদায় দাও। যদি কর্ত্তব্য সাধনে জীবন নিঃশেষিত হয় তবে এ জন্মের মতই বিদায় হইলাম। আর কর্ত্তব্য সাধনের পরেও যদি আত্মরক্ষা করিতে পারি, তবে সত্বর আবার তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া, তোমার সেই স্নেহ পরিপূর্ণ মুখ কমল দর্শন করিয়া, এই শোক সন্তপ্ত হৃদয়কে শীতল করিব।

সেবক শ্রীঅমর সিংহ।"

ছত্রসিংহের নিকট অমরসিংহ এই পত্র পাঠ করিলে পর ছত্রসিংহ বলিল, "ভাই অমর, আমার একটা কথা এই পত্রের মধ্যে লিখিয়া দাও।"

অমরসিংহ। কি কথা?

ছত্রসিংহ। আমার চারি হাজার টাকা আছে। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, মরণকালে সে টাকা তোমাকে দিয়া যাইব। কিন্তু তুমিতো আমার পূর্ব্বেই মরিতে চলিলে। আমার সন্তানাদি পরিবার কিছুই নাই। আমি টাকা দ্বারা আর কি করিব? তুমি চাঁদকুমারীকে লিখিয়া দাও যে, তিনি আমার প্রদত্ত এই চারি হাজার টাকা গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ না করেন। আমি এই সমুদয় টাকা চাঁদকুমারী এবং তাঁহার পুত্রকে এবারেই দিয়া আসিব।

অমরসিংহ তখন পত্রের নিম্নে আবার লিখিলেন,—

"দিদি, এই পত্রবাহক ছত্রসিংহ পিতা নেহালসিংহের একজন পুরাতন বন্ধু। ইনি আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। ইহাঁর পুত্র সন্তান কেহই নাই। দীর্ঘ কাল যাবত্ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সিপাহির কার্য্য করিয়া ইনি চারি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে এই টাকা আমাকে দিয়া যাইবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বেই বোধ হয় আমার মৃত্যু হইবে। ইনি সেই জন্য ইহাঁর সঞ্চিত চারি হাজার টাকা তোমার মহাবীরকে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহাঁর প্রদত্ত টাকা গ্রহণ করিতে তুমি অসম্মতা হইবেনা। কারণ ইনি তোমাকে আপন কন্যা বলিয়া মনে করেন।"

এই পত্র লিখিবার কিছুকাল পরেই রাত্রি অবসান হইল। পাল্কী বেহারাগণ পাল্কীসহ, হাফেজের পত্নী রাত্রে যে গৃহে ছিলেন, সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। লেফটেন্যাণ্ট টম্‌সন্, এনসাইন মেল্‌বিল্ এবং টমকিন্ প্রভৃতি ইংরাজগণ আপন আপন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। সকলেই প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। অমর সিংহ এবং ছত্রসিংহ পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় আজও হাফেজের পত্নীর পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। পাল্কী বেহারাগণ সময় সময় পথে স্কন্ধ হইতে পাল্কী ভূমে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেই, অমর সিংহ এবং ছত্রসিংহ হাফেজ পত্নীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিতেন। এখন হাফেজ পত্নী ইহাদিগকে আপন আত্মীয় মনে করিয়া অকপটে ইহাদিগের সহিত পথে পথে নানা কথা বলিতে লাগিলেন।

দিবাবসানের পূর্ব্বেই সৈন্যগণ হাফেজের পরিবার সহ বিশুলি (Bis-

soolee) সহরে পৌঁছিল। অমর সিংহ প্রভৃতির সংস্কার ছিল যে, হাফেজের পরিবারদিগকে নবাবের আদেশানুসারে লক্ষ্ণৌ লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু নবাব ইহাদিগকে লক্ষ্ণৌ লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন না।

উজীর সুজাউদ্দৌলা যখন স্বয়ং সসৈন্যে রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত আউলা সহরে ছিলেন, তখন সৈন্যগণ হাফেজের পরিবারদিগকে* ধৃত করিতে প্রেরিত হইয়াছিল। এখন নবাব বিশুলিতে আসিয়াছেন। হাফেজের পরিবারদিগকে লইয়া সৈন্যগণ বিশুলি (Bissoolee) সহরে পৌঁছিলে পর, নবাবের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। নবাব বিশুলি হইতে অন্য একজন রোহিলা সরদার ডুন্ধিখাঁর পুত্র কন্যা এবং স্ত্রীকে ধৃত করিতেও সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ডুন্ধিখাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা তাঁহার নিকট আনীত হইলে পর, উজীর সুজাউদ্দৌলা স্বীয় ভগ্নীপতি নবাব স্যালারজঙ্গ বাহাদুরকে সঙ্গে দিয়া, তাহারই রক্ষণে ডুন্ধিখাঁর পরিবার, হাফেজ রহমতের কন্যা ভিন্ন তাহার স্ত্রী ও অন্যান্য পরিবার, এবং আর কয়েক জন রোহিলা সরদারের পরিবারদিগকে আলাহাবাদে কয়েদি স্বরূপ † প্রেরণ করিলেন। শুদ্ধ কেবল হাফেজ রহমতের কন্যাকে দুই চারি জন সিপাহী এবং কয়েক জন দাস দাসী সহ লক্ষ্ণৌ আপন বেগমের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

অমর সিংহ এবং ছত্রসিংহের প্রতিও নবাব স্যালারজঙ্গের সঙ্গে আলাহাবাদ যাইবার হুকুম হইল।

হাফেজনন্দিনীকে এখন মাতৃক্রোড় হইতেও বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। সজল নয়নে তিনি মাতার নিকট হইতে জন্মের মতন বিদায় গ্রহণ করিলেন। মাতা তিন চারিবার কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "এখন পিতৃবৈরী

---

* The family of Hafez Rahmut, with a torpid apathy which is not easy to be accounted for, took no measure either for flight, but continued to remain quietly in the fort of Peeleabete.—Vide C. Hamilton's Rohilla Afghans page 246.

† Shortly after his arrival at Bissoolee the Vizier sent off the sons of Doondee Khan, their wives and children, together with the family and immediate retainers of the Hafiz Rahmut, and numbers of the Afghan inhabitants of Barelee, Owlah, Bissoolee and other places to Allahabad under the conduct of his brother-in-law, the Nabab Salur Jung—C. Hamilton's Rohilla Afghan.

বিনাশের সম্পূর্ণ ভার তোমার হস্তে রহিল। এখন শোক দুঃখ প্রকাশ করিবার সময় নহে। পিতৃবৈরী বিনাশ ব্রত প্রতিপালনে নিশ্চয়ই ঈশ্বর তোমার সহয়তা করিবেন।"

এই বলিয়া বীরপত্নী কন্যার নিকট হইতে বিদায় হইলেন। * কন্যার চক্ষু হইতে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল; ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী শত চেষ্টা করিয়াও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু মাতার চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রুও নিপতিত হইল না। বীরদর্পে তিনি স্বতন্ত্র পাল্কীতে নবাব সৈন্যসহ আলাহাবাদে চলিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

জগদম্বা বেগম।

জৈষ্ঠ মাস। বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। লক্ষ্ণৌর উজীরের রাজ প্রাসাদ হইতে ক্রোশাধিক দূরস্থিত এক খানি জনশূন্য ভগ্ন গৃহে বসিয়া, দুইটী লোক পরস্পরের সহিত কথা বার্ত্তা বলিতেছে।

ইহাদের উভয়ের পরিধানেই সিপাহীর পরিচ্ছদ ছিল। এক জনের বয়ঃক্রম অনূ্যন ষাট্ বৎসর হইয়াছে। দ্বিতীয়ের বয়স ত্রিশবৎসরের অধিক নহে।

বৃদ্ধ সিপাহী তাঁহার সঙ্গী যুবককে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল,

"ভাই অমর, বল দেখি আর কতদিন এখানে এই ভাবে থাকিব? নবাব সুজাউদ্দৌলা এখন পর্য্যন্তও রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করেন নাই।"

"দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, নবাব দুই এক দিনের মধ্যেই এখানে আসিয়া পৌছিবেন। তোমার এখানে থাকিতে যদি বড় কষ্ট বোধ হয়, তুমি না হয় টাকা এবং আমার পত্র লইয়া দিদি চাঁদ কুমারীর নিকট প্রয়াগে চলিয়া যাও।"

এই সিপাহী দ্বয়কে পাঠকগণ বোধ হয় সহজেই চিনিতে পারিবেন। বৃদ্ধ সিপাহী ছত্র সিংহ। আর যুবক অমর সিংহ। উভয়েই নবাব শ্যালার

---

* Mr. Charles Hamilton in his history of Rohilla Afghan does not make any mention of Hafiz Rahmut's daughter. But that she was taken into the harem of Vizier is a fact no one can deny.

জঙ্গের সঙ্গে রোহিলা রমণীগণকে লইয়া আলাহাবাদে যাইতে ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার ছলনা করিয়া ইহারা লক্ষ্ণৌ চলিয়া আসিয়াছে। অমর সিংহের কথা শুনিয়া ছত্র সিংহ বলিল, "ভাই তোমার কিরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তুমি নবাবের প্রাণ বিনাশের পর পলাইয়া যাইতে পার কি না, তাহা না দেখিয়া, এস্থান হইতে চলিয়া যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না। তুমি কি আজও আবার রাত্রে সেই বেগমের বাঁদীটার নিকট যাইবে?"

অমর সিংহ। আজও আবার আমাকে নবাব বাড়ী যাইয়া সেই তোফানী বাঁদীর সহিত রাত্রে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। গত কল্য সে বলিয়াছে যে, আজ একটু অধিক রাত্র হইলে পর নবাব বাড়ীর নিকটস্থ সেই পুষ্করিণীর পারে আমের বাগানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

ছত্র সিংহ। সে বাঁদী কি বলিয়াছে যে তোমাকে গোপনে অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারিবে?

অমর সিংহ। সে মাগীর কোন কথার উপরই বিশ্বাস করিতে পারি না। তাহার যখন যাহা মুখে আইসে তাহাই বলে। কখন বলে যে, সে অনায়াসে আমাকে অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারিবে, আবার কখন বলে যে এরূপ দুঃসাহসের কার্য্য সে কখনই করিবে না। এই স্ত্রীলোকটা বোধ হয় নিতান্ত অসচ্চরিত্রা। এ দেখিতে যদ্রূপ কুৎসিত, ইহার চরিত্রও তদনুরূপই বটে। আমার সহিত কথা বলিবার সময়ে যেরূপ ভাবভঙ্গী করে, তাহাতে ইহার ছায়া স্পর্শ করিতেও আমার ইচ্ছা হয় না। কেবল ইহার সাহায্যে হাফেজ নন্দিনীকে নবাবের অন্দর হইতে বাহির করিবার আশায়ই প্রত্যহ ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি।

ছত্র সিংহ। হাফেজ নন্দিনীকে তবে লক্ষ্ণৌ আনিয়া বড় অন্দরে, স্বয়ং বেগমের নিকট রাখিয়াছে। তাঁহাকে খোর্দ্দ মহলে পাঠায় নাই?

অমর সিংহ। বেগমের অন্দরেই রাখিয়াছে। কিন্তু উজীরের প্রধান স্ত্রী বহু বেগম নাকি হাফেজ নন্দিনীকে বড় যত্ন করেন না। উজীরের অন্দরের মধ্যে জগদম্বা বেগম নামে এক জন প্রবীণা রমণী আছেন। তিনি নাকি হাফেজ নন্দিনীকে আপন কন্যার ন্যায় সস্নেহে প্রতিপালন করিতেছেন। সময়ে সময়ে প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন ও তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাফেজনন্দিনী সর্ব্বদাই বিষণ্ণ বদনে বসিয়া থাকেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না।

ছত্রসিংহ। ভাই এতো বড় সুন্দর নাম। (হাস্য করিয়া) জগদম্বা বেগম! বেগমের নাম জগদম্বা এতো কখন শুনি নাই।

অমরসিংহ। ভাই জগদম্বা বেগম নাম শুনিয়া কাল আমার প্লীহা চমকিয়া উঠিয়াছিল। পরে তাঁহার পরিচয় শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। নহিলে কাল্ই প্রাণত্যাগ করিতাম।

ছত্রসিংহ। ভাই তুমি কথায় কথায়ই প্রাণত্যাগ করিতে চাহ। জগদম্বা বেগম নাম শুনিয়া তোমার প্লীহা চমকিয়া উঠিল কেন? আর তুমি প্রাণত্যাগইবা করিতে কেন?

অমরসিংহ। দাদা আমার জননীর নাম জগদম্বা। তোফানী বাঁদীর মুখে শুনিলাম যে জগদম্বা বেগম নামে যে স্ত্রীলোকটী উজীরের অন্দরে আছেন, তিনি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছেন। এই কথা শুনিয়াই আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল—"তবে কি আমার জননী জাতি ভ্রষ্ট হইয়াও এই ঘৃণিত জীবন ধারণ করিতেছেন? তিনি কি তবে আত্মহত্যা করেন নাই?" মন মধ্যে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবামাত্র, আমি একবারে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়িলাম। কিন্তু কোন প্রকারেই আমার বিশ্বাস হইল না, যে আমার জননী এইরূপ ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছেন। আমি তখন জগদম্বা বেগমের সম্বন্ধে তোফানীকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। আমার প্রশ্নোত্তরে তোফানী যাহা বলিল, তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই অবধারণ করিলাম যে, জগদম্বা বেগম নবাব মীরজাফরের স্ত্রী, দুর্ব্বৃত্ত মীরণের গর্ভধারিণী।

ছত্রসিংহ। মীরজাফরের বেগম এখানে কিরূপে আসিলেন?

অমরসিংহ বলিল, "ভাই সে বিষয় যদি শুনিতে চাহ, তবে অনেক কথা বলিতে হয়। মীরজাফরের বেগম যে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি পূর্ব্বেও জানিতাম। তিনি কি রূপে এখানে আসিয়াছেন শুন।

"নবাব সুজাদ্দৌলা বক্সারের যুদ্ধে পরাস্ত হইলে পর, দিল্লীর সম্রাট এবং বলবন্ত সিংহ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, তৎক্ষণাৎ ইংরাজদিগের শরণাগত হইলেন। সুজাউদ্দৌলা তখন নবাব মীরকাসিমকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌ অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে ইংরাজ সৈন্য সুজাউদ্দৌলাকে এবং মীরকাসিমকে ধৃত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিল। আমি ইহার পর মেজর কার্ণাকের (Major Carnac) অধীনস্থ সৈন্যদিগের সঙ্গে সে বার এদিকে আসিয়াছিলাম।

"ইংরাজেরা তখন আশা করিয়াছিলেন যে, আলাহাবাদ এবং কোরা ব্যতীত, সুজাউদ্দোলাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অযোধ্যাও দিল্লীর সম্রাটকে প্রদান করিবেন। কিন্তু বিলাতে এ প্রস্তাব মঞ্জুর হইল না।

"এদিকে সুজাউদ্দোলা মনে করিতে লাগিলেন যে, মীরকাসিমের সাহায্য করিতে যাইয়াই তাঁহার এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং মীরকাসিমের প্রতিই তাঁহার বিদ্বেষের ভাব উপস্থিত হইল। তিনি লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়া মীরকাসিমের সঙ্গে যে কিছু ধন সম্পত্তি মণিমুক্তা ছিল, তাহা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া রাখিলেন এবং মীরকাসিমকে আপন রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। মীরকাসিম তখন আপন পরিবার সহ রোহিলখণ্ডে যাইয়া বেরিলি সহরে নিতান্ত দীন দুঃখীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মীরকাসিমের সঙ্গে তখন তাঁহার স্ত্রী এবং শাশুড়ী ছিলেন।

"কয়েক দিন পরে মীরকাসিম সৈন্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নেপাল চলিয়া গেলেন। তাঁহার শাশুড়ী এবং স্ত্রী বেরিলিতে রহিলেন।

এদিকে ইংরাজ সৈন্য ক্রমে অগ্রসর হইয়া লক্ষ্ণৌ আক্রমণের উপক্রম করিল। সুজাউদ্দোলাও তখন অত্যন্ত নিরুপায় হইয়া আপন পরিবার লক্ষ্ণৌ হইতে রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত বেরিলিতে প্রেরণ করিলেন; এবং ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা দেখিলেন, যে, সুজাউদ্দোলাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিলেও অযোধ্যায় রাজত্ব করা বড় সহজ নহে। সুতরাং তাঁহারা সুজাউদ্দোলার সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন।

"এই সন্ধির পর সুজাউদ্দোলার জননী সায়দ উন্নিসা বেগম এবং তাঁহার স্ত্রী বহু বেগম বেরিলি হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, মীরকাসিমের স্ত্রী এবং শাশুড়ীকে সঙ্গে করিয়া অযোধ্যায় আনিলেন। মীরকাসিমের শাশুড়ীই নবাব মীরজাফরের স্ত্রী। তিনি স্বীয় কন্যাসহ তদবধি এখানে অবস্থান করিতেছেন। মীরকাসিমের শাশুড়ীকেই নবাবের অন্দরের স্ত্রীলোকেরা জগদম্বা বেগম বলিয়া সম্বোধন করেন। কিন্তু কিজন্য তাঁহাকে জগদম্বা বেগম বলেন, তাহা জানি না।"

অমরসিংহের বাক্যাবসানে ছত্রসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মীরজাফরের স্ত্রী আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া, জামাতার সঙ্গে এখানে আসিলেন কেন?"

অমর সিংহ বলিল যে, শুনিয়াছি মীরজাফরের সঙ্গে তাঁহার প্রধানা স্ত্রীর দীর্ঘকাল হইতেই বিবাদ ছিল। তিনি স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই কন্যা ও জামাতার সঙ্গে একত্র বাস করিতে ছিলেন *।

ইহাদিগের এইরূপ কথা বার্ত্তায় রাত্র হইল। তখন অমর সিংহ তোফানী বাঁদির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত নবাব বাড়ীর দিকে চলিল। ছত্র-সিংহ গৃহে বসিয়া আহারের আয়োজন করিতে লাগিল।

নবম অধ্যায়।

প্রেমিকা।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে, অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ নবাব স্নজা-উদ্দৌলার আদেশানুসারে নবাব স্যালারজঙ্গ এবং অন্যান্য সৈন্যের সঙ্গে রোহিলা রমণীগণকে লইয়া আলাহাবাদে যাইতে ছিল। কতক দূর গেলে পর ইহারা দুইজন শারীরিক অসুস্থতার ছলনা করিয়া লক্ষ্ণৌ চলিয়া আসিয়াছে।

আজ চারি দিন হইল, ইহারা লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়াছে। এখানে পৌঁছিয়াই অমরসিংহ হাফেজ নন্দিনী কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিল। প্রথম দিনের অনুসন্ধানে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। কিন্তু আজ তিন দিন হইল নবাবের বাড়ীর নিকটস্থিত পুষ্করিণীর পারে কোন একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে অমর সিংহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

---

* মীরজাফরের সহিত যে তাঁহার প্রধানা স্ত্রী মীরণের মাতার বিবাদ ছিল, তাহার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হইয়া যে দিবস কলিকাতা রওনা হইলেন, সেই দিন কাপ্তান কলিয়ড্ বাস্সিটার্ট সাহেবের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত কথা কয়েকটী লিখিত ছিল—

"His legitimate wife, called the Begum, the mother of the deceased Chota Nabab and of Kasimali's wife, refused to accompany the old Nabab, with whom, she says, she has not been in good harmony, for long time past, that she is very glad the Government is put into such good hands; and she should live much happier with her daughter and son-in-law."

অমর সিংহ বিলক্ষণ জানিত যে, অন্দরের কোন একটী বাঁদীর সাহায্য ভিন্ন হাফেজ নন্দিনীর কোন সংবাদ পাইবার সাধ্য নাই। সুতরাং নবাব বাড়ীর নিকটস্থ পুষ্করিণীর পারে একটী কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া, অমর সিংহ ধীরে ধীরে তাহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"আপনি কি এই নবাববাড়ীর লোক? আপনি কি নবাব বাড়ীতে থাকেন?"

স্ত্রীলোকটী অমরসিংহের প্রশ্ন শ্রবণে একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। সে হাসির অর্থ এই যে, আমি বেগমের প্রধান বাঁদী আমাকে এই লোকটা চিনে না? এ পৃথিবীতে আমাকে চিনেনা এমন লোক কি কোথাও আছে? আমি তোফেজ্জাল উন্নিসা খাতুন।

অমরসিংহ তখন আবার বিনীতভাবে বলিল, "নবাবের অন্দরের কোন বাঁদীর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?"

এ প্রশ্ন শুনিয়া স্ত্রীলোকটা আরও হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। অমর সিংহ তাহাকে এইরূপ হাস্য করিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

কিছুকাল পরে স্ত্রীলোক আত্ম পরিচয় প্রদানে বলিল, যে সে অযোধ্যার বেগমের প্রধান পরিচারিকা। অন্যান্য শত শত বাঁদী তাহার অধীনে থাকিয়া কাজ করে। স্বয়ং বেগম পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্য করেন না। এ পৃথিবীতে তাঁহাকে চিনেনা এমন লোক কি আছে?

অমর সিংহ এখন স্ত্রীলোকটির হাস্য করিবার কারণ বুঝিতে সমর্থ হইল; এবং আরও অধিক বিনীত ভাবে বলিল, "তবে আপনি অবশ্য নবাব বাড়ীর সকল খবরই জানেন।"

স্ত্রীলোক। আমি সকল খবর জানি না, তবে কে জানে? তুমি কি চাও?

অমর সিংহ। আজ্ঞে আমি কিছু চাহি না। সে দিন শুনিলাম যে, নবাব এক জন নূতন বেগম আনিয়াছেন। তাহাকেই প্রধান বেগম করিয়া বড় অন্দরে রাখিবেন। প্রধান বেগমকে এখন খোর্দ্দ মহলে পাঠাইয়া দিবেন।

স্ত্রীলোক। (হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) বেগমকে খোর্দ্দ মহলে পাঠাইয়া দিবেন! এও কি সম্ভব? হাজার নূতন বেগম আসিলেও খাস্ মহলে বেগমই থাকিবেন। টাকা কড়ি সকলই বেগমের হাতে থাকে।

বেগমের লক্ষ লক্ষ টাকার জায়গীর আছে। নবাবের কি আছে? নবাব তো বেগমের গোলাম।

অমর সিংহ। এই নূতন বেগম শুনিয়াছি বড় সুন্দরী।

স্ত্রীলোক। আঃ ভারি সুন্দরী। শরীরে মাংস নাই। কয়েক খানা হাড় মাত্র। দেখিতে খাট। আমাদের মতন একটু লম্বা মোটা সোটা না হইলে কি আর নবাব আমির উমরার নজর পড়ে। তবে এ ছুঁড়ী হাফেজ রহমতের কন্যা। উজীর যখন ইহাকে আনিয়াছেন, তখন কয়েক দিন বড় অন্দরে রাখিয়া, পরে খোর্দ্দ মহলে পাঠাইয়া দিবেন।

অমর সিংহ। নূতন বেগম এখানে আসিয়াছেন পর বুঝি বেশ আমোদ আহ্লাদে আছেন।

স্ত্রীলোক। ছাই আমোদ আহ্লাদ। দিন রাত্র কেবল তাহার চক্ষের জল পড়িতেছে। কাহারও সঙ্গে কথাও বলে না। কথা বলিতে জানেও না। ও কি আর উজীরকে বশ করিতে পারিবে।

অমরসিংহ। তবে বড় বেগম্ বুঝি ইহাকে এইরূপ দুঃখিত দেখিয়া ইহার প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করেন।

স্ত্রীলোক। বেগমের আর কাজ নাই, ঐ মেয়েটাকে দয়া করিতে যাবেন। বেগম তাকে বড় একটা জিজ্ঞাসাও করেন না। করিবেনইবা কেন? তিনি নবাবের প্রধান বেগম। তিনি এখন যাইবেন ঐ মেয়েটার সঙ্গে কথা বলিতে? তবে বুড়া বেগমের অন্দরের জগদম্বা বেগম এ ছুঁড়ীকে মেয়ের মতন প্রতিপালন করিতেছেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অমর সিংহ জগদম্বা বেগমের নাম শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে তোফানীকে অনেক প্রশ্ন করিয়া জানিতে পায়, জগদম্বা বেগম বঙ্গদেশের নবাব মীরজাফরের স্ত্রী। এই বিষয় অবধারিত হইলে পর সে আশ্বস্ত হইল।

প্রথম দিন তোফানীর সঙ্গে অমর সিংহের আর অধিক বাক্যালাপ হইল না। এই সকল কথাবার্ত্তার পর পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া যাইবার সময় অমর সিংহ তোফানীকে বলিল "আপনার সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। কাল আবার আপনি দয়া করিয়া এখানে আসিবেন?"

তোফানী অমর সিংহের এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। তাহার মনে হইল যে, অমর সিংহ তাহার রূপ দেখিয়া একবারে তাহার জন্য পাগল হইয়াছে। তোফানীর মনে ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, কাল একটু অল্প বেলা থাকিতে আসিলে আনার সঙ্গে তোমার এখানেই দেখা হইবে। এখন আর দেরী করিতে পারি না। বেগমের গোছলের সময় হইয়াছে।"

এই কথা বলিয়া তোফানী নবাব বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। বেগমের স্নানের সময় তোফানীকে বেগমের শরীর মার্জ্জন করিতে হইত।

অমরসিংহও পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত জনশূন্য ভগ্ন গৃহে আসিয়া, ছত্র সিংহের সঙ্গে একত্রে সেখানে অবস্থান করিতে লাগিল।

ইহার পর দিবস অপরাহ্ণে আবার তোফানীর সঙ্গে অমর সিংহের সেই পুষ্করিণীর পারেই সাক্ষাৎ হইল। তোফানী অমর সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় তাহার আসিবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এখানে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এক ঘণ্টা পরে অমর সিংহও আসিয়া উপস্থিত হইল।

আজ তোফানী অমর সিংহের সঙ্গে কথা বলিবার সময়ে নানা প্রকার কুৎসিত ভাব ভঙ্গী করিতে লাগিল। ইহাতে অমর সিংহ মনে মনে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইল। কিন্তু তোফানীর সাহায্যে হাফেজ নন্দিনীকে উদ্ধার করিবার আশায় হৃদয়স্থিত সে বিরক্তির ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করিল।

অনেক কথা বার্ত্তার পর অমরসিংহ বলিল—

"তুমি গোপনে এক দিন আমাকে নবাবের অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারিবে?"

তোফানী একবার বলিল, "পারিব বই কি। আবার কিছু কাল চিন্তা করিয়া বলিল যে, ধরা পড়িলে আমাদের দুজনেরই মাথা কাটা যাইবে এইরূপ দুঃসাহসের কার্য্য আমি করিতে পারিব না।"

অমর সিংহ অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ। তোফানীর ইচ্ছা যে অমর সিংহ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে নিকা করে। কিন্তু স্ত্রীলোক শত কুচরিত্রা হইলেও একেবারে পষ্টাক্ষরে পুরুষের নিকট এইরূপ কথা বলিতে তাহার লজ্জা হয়। সুতরাং তোফানী ভাব ভঙ্গী দ্বারা আপন মনের ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অমরসিংহ তোফানীর সে ভাব ভঙ্গী যেন বুঝিয়াও বুঝে না। সে কেবল হাফেজ নন্দিনীর বিষয় প্রকারান্তরে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। অনেক বাক্যালাপের পর তোফানী বলিল, "আজ আর দেরী করিতে পারি না। বেগমের গোছলের সময় হইয়াছে। গোছলের পর তিনি নেমাজ পড়িবেন। কাল তুমি বৈকালে এই সময় না আসিয়া, বরং আহারের পর রাত্রে আসিবে, তাহা হইলে আমরা অনেকক্ষণ বসিয়া কথা বার্ত্তা বলিতে পারিব।"

অমরসিংহ তোফানীর এই কথা শুনিয়া চলিয়া গেল। তোফানীও নবাব বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

আজ সেই তৃতীয় দিবস। অমরসিংহ রাত্রে ছত্র সিংহের নিকট হইতে বিদায় হইয়া তোফানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত পুষ্করিণীর পারে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে তোফানী আজ বেলা প্রহরেক থাকিতে নবাবের অন্দরের মধ্যে নিজের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক আয়েনা হাতে করিয়া আপন কেশ বিন্যাস করিতে লাগিল। তাহার মস্তকে অধিক কেশ ছিল না। টাক্ পড়া মাথা। কিন্তু কেশ বিন্যাসে যত্নের কোন ত্রুটি হইল না। কেশ বিন্যাসের পর বেগমের প্রদত্ত একখানি অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিল। তোফানীর বদ্ধমূল সংস্কার রহিয়াছে, যে, সে অত্যন্ত রূপবতী। এইরূপ সংস্কার বোধ হয় অনেকানেক স্ত্রীলোকেরই আছে। কিন্তু কি স্ত্রী লোক, কি পুরুষ, যাহাদের এইরূপ সংস্কার আছে, তাহাদিগকে আমরা দোষ দিতে পারি না। পরমেশ্বর মনুষ্যের চক্ষু দুইটী এমন স্থানে রাখিয়াছেন, যে, মানুষ অপর সকলের মুখ দেখিতে পায়, কিন্তু তাহার আপন মুখ দেখিবার সাধ্য নাই। সুতরাং অন্যের মুখাকৃতিতে যে সকল দোষ থাকে তাহাই কেবল তাহার চক্ষে পড়ে। নিজের মুখাকৃতির দোষ সে কখনও দেখিতে পায় না।

তোফানী কেশ বিন্যাস এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আপন শয্যার পার্শ্বে বসিয়া একাকিনী চিন্তা করিতে লাগিল—"ও বামন বড় নির্ব্বোধ। নির্ব্বোধ না হইলে আমাকে নিকা করিবার কথা বলে না কেন? একবার যদি বলে যে, আমাকে নিকা করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হইব। আমি কি আর অস্বীকার করিব? আমাকে নিকাকরিবার জন্য যে ওর ইচ্ছা হইয়াছে, তাতো স্পষ্টই বুঝা যায়। ওর ইচ্ছা না হইলে, ও রোজ রোজ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে কেন? আসল কথা, হতভাগা বামন

মনে করে যে, আমি নবাবের ঘরের প্রধান বাঁদী। আমাকে নিকা করিতে চাহিলে লক্ষ টাকার কাবিন দিতে হইবে। আমি কি আর ওর কাছে কাবিনের দাবী করিব? ও যে সুন্দর পুরুষ, ওর কাছে আর কেহ কাবিনের দাবী করিবে না। ওর সঙ্গে আমারই মিল হয়। ও যেমন অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ, আমিও সেইরূপ সুন্দরী। ওর সঙ্গে নিকা হইলে আমি আর এখানে থাকিব না। বেগমের নিকট বলিয়া কহিয়া বিদায় হইয়া যাইব। কিন্তু বামন মুখ খুলে কিছুই বলেনা। তবে কি আমিই প্রথম ওকে মনের কথা বলিব? একেবারে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়াইবা ওকে সে কথা কেমন করিয়া বলি? দূর হউক হতভাগা বামন, নিকা না হইলেও আমি এতদূর নিলর্জ্জ হইতে পারিব না। কিন্তু যাহা হয় আজই একটা কিছু করিতে হইবে। আর রোজ রোজ ঘরের কাজ কর্ম্ম ফেলে এখন ওর জন্য যাইয়া পুষ্করিণীর পারে বসিয়া থাকিতে পারি না। কাল প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত ওর জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। যদি আজ নিকা করিবার কথা বলে, তবেতো সকল দিকই রক্ষা হয়। আমারও লজ্জাটা থাকে, ওরও কার্য্য সিদ্ধি হয়। আর যদি কালিকার মত চুপ করিয়া থাকে, তবে না হয় আমি নিজেই বলিব। ও বামনার কাছে আমার এত লজ্জা কি? ওতো আর আমার শ্বশুর নহে, ভাশুরও নহে। বিদেশী লোক, কেবা জানিবে, কেবা শুনিবে। এক কথা বলিব, হয় তো হইল, না হয়, নাইবা হইল। বামুনার জন্য এই তিন দিন যাবত্ পুষ্করিণীর পারে যাইতে হইতেছে। যদি নিকা অস্বীকার করে ওর গায়ে থু থু দিয়া, ওর নাকের উপর এক কিল দিয়া চলিয়া আসিব। বেটা কি শুদ্ধাচারী বামন! একটু কাছে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেও বেটা সরিয়া দাঁড়ায়।

"কাল বলিলাম যে আমি তোমাকে মুরগীর কাবাব রান্ধিয়া দিব। বেটা ঘৃণা করিয়া থুথু ফেলিতে লাগিল। বেটা বামন—খান্ আতপ চাউল আর কলা—ও আর কাবাবের মজা কি বুঝিবে। ওর সাত পুরুষের মধ্যেও মুরগী খায় নাই—কিন্তু হিন্দুর ছেলে একবার মুরগী ধরিলে কি আর ছাড়িতে চাহিবে।"

তোফানী স্বীয় প্রকোষ্টের দ্বার রুদ্ধ করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছে। অকস্মাৎ এর্‌ফানী আসিয়া তাহার দ্বার ধরিয়া ঠেলিতে লাগিল। তোফানী চমকিয়া উঠিয়া বলিল "কে কে?"

এরফাণী বলিল "বেগমের গোছলের সময় হইয়াছে। তোকে বার বার ডাকিতেছেন। তোকে খুঁজিতে খুঁজিতে আমার প্রাণ শেষ হইয়াছে।

তোফানী এই কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ী দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। তাহাকে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সুসজ্জিত দেখিয়া এর্‌ফানী বলিল, "আজ এত সাজ গাজ কেনলো?"

তোফানী। (হাস্য করিয়া) আজ আমার খসমের কাছে যাইব।

এরফানী। তোমার আবার খসম। এজন্মে তো না।

তোফানী। কেন, আমি ইচ্ছা করিলেও কি আর তোর মত নিকা করিতে পারি না? তবে কি এখন তোর মত যাকে তাকে নিকা করিব।

এরফানী। চক্ষু থাকিতে কেহ তোমাকে নিকা করিবে না। তবে ইচ্ছা করিলে সেই অন্ধ লোকটা, যে নবাব বাড়ীর দ্বারে ভিক্ষা করে, তার সঙ্গে জুট্‌তে পারে।

তোফানী। সে অন্ধের কাছে কেন?

এরফানী। তুমি কেমন রূপবতী তাতো আর সে দেখিতে পায় না।

তোফানী এর্‌ফানীর উপর অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, আর তাহার সঙ্গে কোন কথা বলিল না, বেগমের নিকট চলিয়া গেল। বেগমকে স্নান করাইয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সেই পুষ্করিণীর পারে অমর সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। আজ অমর সিংহ পূর্ব্বেই আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তোফানী মনে করিল তাহার প্রতি অমর সিংহের প্রণয় ক্রমে গাঢ় হইতেছে।

ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে নানা কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। তোফানী অমর সিংহকে প্রকারান্তরে তাহাদের পরস্পরের বিবাহ সম্বন্ধীয় কথার মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু অমর সিংহ সে সকল কথার উত্তর না দিয়া, কেবল বেগম এবং হাফেজ নন্দিনীর বিষয়ই নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

অমর সিংহের মুখ্য অভিপ্রায় যে নবাব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কোন প্রকারে গোপনে তাহার অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিবে। এই বিষয়ই তোফানীর সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। তোফানী দেখিল যে, ইহাকে গোপনে অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ করিয়া না দিলে, ইহার সহিত বিবাহের বড় আশা নাই। সুতরাং প্রায় দুই ঘণ্টা কথাবার্ত্তার পর

তোফানী বলিল—

"কাল রাত্র এগারটার সময়ে তুমি এখানে আসিবে। আমি তোমাকে স্ত্রীলোকের পোষাক পরাইয়া নবাবের অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইব। কাল নবাব বাড়ী আসিবেন। সকলেই আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত থাকিবে। কাল যেমন সুবিধা হইবে, এমন সুবিধা আর কখনও হইবে না।"

অমর সিংহ এই কথা শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইল। এপর্য্যন্ত তোফানী তাহার কাছে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেই অমর সিংহ পশ্চাতে সরিয়া যাইত। কারণ তোফানীর কথা বলিবার সময় তাঁহার মুখ হইতে অবিশ্রান্ত সুধামৃত বর্ষিত হইত। কিন্তু তোফানী তাহাকে গোপনে অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইলে পর, সে তোফানীকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাহার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে দিল, আজ আর তোফানীর নিকট হইতে সরিয়া গেল না। তোফানী ভাবিল যে অমর সিংহ আজ প্রেমের আর এক সিঁড়ী আরোহণ করিয়াছে।

কিন্তু অমর সিংহ মনে মনে ঠিক করিয়া বসিয়া আছে যে, গৃহে যাইবার সময়ে পথে নদীতে স্নান করিয়া যাইবে।

অনেক কথা বার্ত্তার পর পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল। অমরসিংহ পথে গঙ্গাস্নান করিয়া ভগ্ন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ছত্রসিংহের নিকট সমুদয় কথা বলিল।

দশম অধ্যায়।

নায়িকা—কিন্তু প্রেমিকা নহে।

যে উপন্যাসের মধ্যে এক জন প্রগাঢ় প্রেমিক নায়ক এবং অতি সুর-সিকা প্রেমিকা নায়িকা না থাকে, সে উপন্যাস বঙ্গীয় পাঠক এবং পাঠিকা-দিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে কি না বলিতে পারি না। বঙ্গীয় সুবিজ্ঞ গ্রন্থকারদিগের কর্ত্তৃক আজপর্য্যন্ত যে সকল উপন্যাস বিরচিত হইয়াছে তৎ-সমুদয়ের মধ্যেই প্রেমিক নায়ক এবং প্রেমিকা নায়িকার বর্ত্তমানতা পরি-

লক্ষিত হয়। এই উপন্যাসের মধ্যে কোন নায়ক নাই। অযোধ্যার বেগমকে আমরা পাঠকগণের নিকট নায়িকা বলিয়া উপস্থিত করিতেছি। কিন্তু তিনিও প্রেমিকা নহেন। উপন্যাসের মধ্যে কোন নায়ক নাই বলিয়া যদি উপন্যাসটী অঙ্গহীন হইয়া থাকে, তবে পাঠকগণ লেখকের এই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

সুবিজ্ঞ বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগের লিখিত উপন্যাসের মধ্যে নায়ক প্রায়ই একজন প্রেমিক যুবক। আর নায়িকা এক জন যারপরনাই প্রেমিকা যুবতী। ইহারা পরস্পর পরস্পরের সম্মিলন লাভার্থ উন্মত্ত-প্রায় হইয়া পড়েন। এদিকে কার্য্যজগতের কার্য্যকারণ শৃঙ্খল, দেশাচার, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ইহাদিগের পরস্পরের সম্মিলন সম্বন্ধে ঘোর বাধা প্রদান করিতে থাকে। তখন প্রেমিক নায়ক এবং প্রেমিকা নায়িকা বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক সেই সকল দেশাচার এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। সংগ্রামে সকল শত্রুকে পরাজয় করিয়া অবশেষে যুবক নায়ক যারপরনাই প্রেমিকা যুবতী নায়িকার সম্মিলন লাভ করেন। কয়েক দিন পরে তাঁহাদের সন্তানাদি হয়; এবং তৎপর তাঁহারা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে কাল যাপন করিতে থাকেন। মানব জীবনের এই অপরূপ আলেখ্যই বঙ্গীয় উপন্যাসে চিত্রিত হয়। ঈদৃশ জীবনালেখ্য বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকাগণের মন সহজে আকর্ষণ করে। প্রেমরাজ্যেই বাঙ্গালীর বীরত্ব। প্রেমিক ও প্রেমিকার উপাখ্যান বঙ্গীয় পাঠক বিশেষতঃ পাঠিকাদিগের বিশেষ সুখপাঠ্য।

কিন্তু এই উপন্যাস লেখকের প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিবার একেবারেই অধিকার নাই। ইহার বিরুদ্ধে প্রেমরাজ্যের দ্বার চিরকালই রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং প্রেম-উপাখ্যান দ্বারা পাঠক ও পাঠিকাগণের মনোরঞ্জন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

লেখক দিবসে কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, শত শত কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিতেছেন। সেই সকল কর্ত্তব্যলঙ্ঘন নিবন্ধন রাত্রে ঘোর অনুতাপানল তাঁহার হৃদয় মধ্যে জ্বলিতে থাকে। অনুতাপানলে লেখকের হৃদয় মন সর্ব্বদাই উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার মনে প্রেমচন্দ্রের প্রবেশ করিবার আর সুযোগ হয় না। হৃদয় মন একটু শীতল না হইলে কি আর তন্মধ্যে প্রেমচন্দ্র প্রবেশ করিতে পারে?

সুশীতল বায়ু সংস্পর্শেই প্রেমের উদয় হয়; সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোক সংস্পর্শেই প্রেমের আবির্ভাব হয়; মেঘাড়ম্বর হইলেই প্রেমিকের প্রেমের ভাব উপস্থিত হয়; রাত্রে একটু বৃষ্টি পড়িলেই প্রেমিকের হৃদয় উথলিয়া উঠে। কিন্তু চৈত্র মাসের দুই প্রহরের রৌদ্রের সময় কাহারও মনে প্রেমের উদয় হয় না। তবে কোন কোন বঙ্গীয় গ্রন্থকারকে প্রেমবীর বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের নিকট চৈত্র বৈশাখ জৈষ্ঠ সকলই সমান। কি যৌবনে, কি বৃদ্ধ বয়সে, সকল সময়েই তাঁহাদের হৃদয় হইতে সমভাবে প্রেমরস নির্গত হইতেছে। সর্ব্বদাই কেবল কৃষ্ণলীলা।

এই উপন্যাসে একদিকে যদ্রূপ নায়ক নাই, পক্ষান্তরে আবার সুরসিকা নায়িকার প্রেমালাপের নাম গন্ধ ও নাই। ইহাতে কেবল কর্ত্তব্য লঙ্ঘন এবং তন্নিবন্ধন অনুতাপ স্বরূপ প্রায়শ্চিত্তের কথাই বিবৃত হইয়াছে।

পাঠক ও পাঠিকাগণ সমুদয় পুস্তক পাঠ করিয়া, আবার জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, অযোধ্যার বেগম কিরূপে এই উপন্যাসের নায়িকা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন? উপন্যাসোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় সকলের হৃদয়েই এক প্রকার না এক প্রকার অনুতাপানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, সকলকে এক প্রকারে না এক প্রকারে আপন আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। তবে অযোধ্যার বেগম নায়িকা বলিয়া কেন নির্ব্বাচিত হইলেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" বঙ্গীয় সুলেখক দিগের লিখিত প্রেমোপন্যাসের মধ্যে যে কয়েকটী লোকের জীবনালেখ্য চিত্রিত হয় তন্মধ্যে যে যুবক এবং যুবতীর পেটভরা প্রেম থাকে, তাহারা দুই জনই নায়ক ও নায়িকা রূপে পাঠকের নিকট পরিচিত হয়েন।

এই সকল গ্রন্থকারের সদ্দৃষ্টান্ত অনুকরণ পূর্ব্বক লেখক অযোধ্যার বেগমকেই নায়িকা বলিয়া পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন। এই উপন্যাসের লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অযোধ্যার বেগমই গুরুতর কর্ত্তব্য লঙ্ঘন নিবন্ধন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন; সুতরাং প্রেমোপন্যাসে যে যুবতীর জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রেম বিকসিত হয়, তিনি যদি নায়িকা হইতে পারেন; তবে কর্ত্তব্য লঙ্ঘন এবং অনুতাপ বিষয়ক উপন্যাসের উল্লিখিত ব্যক্তিগণ মধ্যে যিনি অধিক পরিমাণে কর্ত্তব্য

লঙ্ঘন নিবন্ধন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম কষ্ট সহ্য করেন, তিনি কেন নায়িকা হইবেন না? অতএব অযোধ্যার বেগমকে এই পুস্তকের নায়িকা বলিয়া উপস্থিত করিলে লেখক বিশেষ অপরাধী হইতে পারেন না।

বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকাদিগের নিকট লেখকের আর একটি বিষয় বলিতে হইল। বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকাগণ বলিবেন, আজ কাল বাঙ্গালী রমণীদিগের মধ্যে একটু সাংগ্রামিক ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গৃহের মধ্যে শাশুড়ী ননদিনীর সঙ্গে প্রায়ই ইহাদের তুমুল সংগ্রাম হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় লেখকের উচিত নহে, যে, বঙ্গ মহিলাদিগকে তিনি ভীরু বলিয়া অভিহিত করেন। অন্ততঃ বঙ্গমহিলাদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত লেখক মনে করিলে অনায়াসে তাহাদিগকে পুরুষের পরিচ্ছদ প্রদানান্তর নবীনানন্দ নামে অভিহিত করিয়া দুই একটা সংগ্রামক্ষেত্রেও পাঠাইতে পারিতেন।

কিন্তু লেখক ছদ্মবেশ বড়ই ঘৃণা করেন। লেখকের মতে স্ত্রীলোক দিগকে পুরুষের পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া সমরক্ষেত্রে প্রেরণ করা উচিত নহে। বঙ্গ মহিলাগণ যদি সত্য সত্যই অশ্বারোহণে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইয়া থাকেন, তবে তাহাদিগকে পাছা পেড়ে সাড়ী পরাইয়া কাপ্তান কমলমণি, মেজর বিমলা, কর্ণেল সূর্য্যমুখী, ফিল্‌ড্‌ মার্শেল সৌদামিনী ইত্যাদি নাম প্রদানান্তর সমরক্ষেত্রে উপস্থিত করাই কর্ত্তব্য। তাঁহারা পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া কাপুরুষতা প্রদর্শন করিবেন কেন?

পাঠক ও পাঠিকা ভিন্ন বঙ্গীয় সমালোচকদিগের নিকটও লেখকের একটি নিবেদন আছে। বিগত বিংশবৎসর যাবৎ বঙ্গীয় সমালোচকগণ কেবল প্রেমোপন্যাসই সমালোচনা করিতেছেন। তাঁহারা আপন আপন সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রিকা লইয়া এত ব্যস্ত থাকেন যে, পুস্তক সমালোচনা করিতে হইলে সমুদয় পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহাদের সমালোচনা করিবার অবকাশ হয় না। কোন উপন্যাস সমালোচনার্থ তাঁহাদের হস্তে পড়িলেই তাঁহারা উপন্যাসের লিখিত কেবল প্রেমিকার জীবনালেখ্য পাঠ করিয়াই সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু এই উপন্যাসে তোফানী ভিন্ন আর প্রেমিকা নাই; এবং তোফানীর অধ্যায় ভিন্ন আর কোথাও প্রেমের কথা নাই। সমালোচকগণ যদি কেবল তোফানীর অধ্যায় পাঠ করিয়া সমগ্র পুস্তক সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা তোফানীকে এই পুস্তকের নায়িকা বলিয়া অবধারণ করিবেন এবং

পুস্তক অযোধ্যার বেগম নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া, লেখককে নিন্দা করিবেন। তাঁহারা আরও বলিবেন, যে, লেখকের বিশুদ্ধ প্রেমিকার ছবি অঙ্কিত করিবার সাধ্য নাই।

কিন্তু লেখকের এ সম্বন্ধে বড়ই দুর্ভাগ্য। লেখক এসংসারে কেবল তোফানীর প্রেমের ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেমই সাধারণতঃ দেখিতে পায়েন। সুবিজ্ঞ গ্রন্থকারদিগের বিরচিত প্রেমোপন্যাসে যেরূপ প্রেমের কথা লিখিত আছে, সেইরূপ প্রেম লেখক বড় একটা দেখিতে পাইলেন না। ঈদৃশাবস্থায় ঐতিহাসিক উপন্যাসে কিরূপে মিথ্যা কথা লিখিবেন। সুতরাং লেখক বাধ্য হইয়া তোফানীকেই প্রেম বিভাগের উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন।

নায়িকা সম্বন্ধে আর অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই। ভূমিকা লিখিতে গেলে, ইচ্ছা না থাকিলেও তাহা আপনা আপনিই সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে। আমরা পাঠকদিগের নিকট এখন এ উপন্যাসের নায়িকাকে উপস্থিত করিব।

এই উপন্যাসের নায়িকা অযোধ্যার উজীর সুজাউদ্দৌলার প্রধানা স্ত্রী বহু বেগম অথবা বাবু বেগম। ইনি দিল্লীর একজন প্রধান উমরার কন্যা ইঁহাকে বিবাহ করিবার সময় উজীরকে প্রায় দুই তিন কোটী টাকার। কাবিন লিখিয়া দিতে হইয়াছিলল। ইনি উচ্চ ভদ্রবংশজাতা হইলেও এত টাকার কাবিন পাইবার উপযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু সুজাউদ্দৌলার পিতা সব্‌দর্ জঙ্গ দিল্লীর প্রধান উম্‌রা সাদতালির কন্যা সায়দ উন্নিসাকে বিবাহ করিবার সময় প্রায় চারিকোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি কাবিন স্বরূপ লিখিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং বাবুবেগমের পিতাও উজীর সুজাউদ্দৌলার নিকট সেই পরিমাণ কাবিন দাবী করিলেন।

উজীর সবদরজঙ্গ এবং তাহার পুত্র বর্ত্তমান উজীর সুজাউদ্দৌলা এইরূপে বিবাহোপলক্ষে কাবিন প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া অযোধ্যার রাজকোষ একেবারে শূন্য হইল। নগদ যত টাকা ছিল, তৎসমুদয়ই বেগমদিগের হস্ত গত হইল। সবদরজঙ্গ এবং সুজাউদ্দৌলার কাবিন প্রদান কালে নগদ টাকা দ্বারা সমুদয় কাবিনের দেনা পরিশোধ হইল না। সুতরাং পিতা পুত্র দুই জনকেই আপন আপন বিবাহের সময়ে অনেকানেক মূল্যবান পৈত্রিক জায়গীর আপন আপন স্ত্রীকে লিখিয়া দিতে হইল।

অযোধ্যায় দুই প্রকার জায়গীর ছিল। নিষ্কর জায়গীর আর খিরাজি জায়গীর। নিষ্কর জায়গীর বঙ্গদেশের নিষ্কর দেবত্র ব্রহ্মত্র জমির সদৃশ ভূমি সম্পত্তি। আর খিরাজী জায়গীর বঙ্গ দেশের জমিদারীর ন্যায় কর-প্রদ সম্পত্তি। বেগমদিগের অধিকাংশ জায়গীরই নিষ্কর ছিল। বহু বেগম কিম্বা সায়দ উন্নিসাবেগমের জায়গীরের বার্ষিক উপস্বত্ব অন্যূন বিশ ত্রিশ লক্ষ টাকা ছিল।

উজীরের সাধারণ ধনাগারে অধিক টাকা সঞ্চিত থাকিত না। কথনও কথনও উজীরকে আপন স্ত্রী ও মাতার নিকট হইতে টাকা ঋণ করিতে হইত। কিন্তু তিনি যথাসময় সে ঋণ পরিশোধ করিতেন।

নবাব সুজাউদ্দৌলা অত্যন্ত কামাসক্ত নরপিশাচ ছিলেন। সর্ব্বদাই তিনি ব্যভিচার ইত্যাদি কুকার্য্যে রত থাকিতেন। বহু বেগমের এই সকল বিষয় নিবারণ করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু সময়ে সময়ে নবাবকে তাঁহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইত বলিয়াই নবাবের উপর তাঁহার কিছু প্রভুত্ব ছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বহু বেগম প্রেমিকা নহেন। উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণের মধ্যে যে সম্বন্ধ উজীর এবং তাঁহার মধ্যে প্রায় সেই সম্বন্ধই ছিল। বেগমেরা স্বামীর নিকট হইতে বিপুল অর্থ সম্পত্তি লাভই স্বামীর ভালবাসার চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেন। অর্থ সম্পত্তিই তাঁহাদিগকে সুখী করিত। স্বামীর হৃদয়ে একাধিপত্য করিবার চেষ্টাও তাঁহারা করিতেন না।

এ সংসারে অর্থ সম্পত্তির লিপ্সাই মানুষকে ঘোর মোহান্ধকারে নিপতিত করিয়া চরমে তাহাদিগকে বিনাশের দিকে পরিচালন করে। অযোধ্যার বেগম মোহান্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছেন। ধীরে ধীরে তাঁহার জীবনতরী বিনাশের দিকে পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু সে বিষয়ে চৈতন্য নাই, সে বিষয়ে জ্ঞান নাই, ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছেন।

রোহিলা যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। রোহিলা যুদ্ধে নবাবের জয় লাভ হইয়াছে। অনেকানেক রোহিলা সরদারের জায়গীর নবাবের হস্তগত হইয়াছে। বেগম ভাবিতেছেন, এবার রোহিলখণ্ডের মধ্যের আর কয়েক খানি বড় বড় জায়গীর নবাবের নিকট হইতে চাহিয়া লইবেন। এখন নবাব বাড়ী আসিলেই হয়। বেগম নবাবের পথ চাহিয়া রহিয়াছেন।

এদিকে নবাব সসৈন্যে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। লক্ষ্ণৌতে খবর পৌঁছিল আগামী কল্য অপরাহ্ণে নবাব রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিবেন।

একাদশ অধ্যায়।

স্বপ্ন।

আজ রজনী প্রভাত হইবামাত্রই লক্ষ্ণৌ লোকারণ্যের কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। নগরবাসী কি বণিক কি দোকানদার সকলেই আপন আপন গৃহপ্রাঙ্গন সুসজ্জিত করিতে লাগিল। প্রত্যেক গৃহ দ্বারে কদলীবৃক্ষ রোপিত হইল। সহরের বালকগণ নিশান হাতে করিয়া দলে দলে পথ রোধ করিয়া চলিতে লাগিল। সময় সময় ইহারা "ঐ নবাবের সৈন্য দেখা যায়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল। ইহাদের কথায় প্রতারিত হইয়া দোকানদার এবং পসারিগণ হাতের কাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ এইরূপে প্রতারিত হইয়া, শালা, বজ্জাত মিথ্যাবাদী ইত্যাদি সুললিত শব্দে বালকদিগকে অভিহিত করিতে লাগিল।

নবাবের প্রাসাদেও আজ বিশেষ সমারোহ হইতে লাগিল। প্রাতঃকাল হইতে দলে দলে গায়িকা, নর্ত্তকী, বাদ্যকর আসিয়া নবাব বাড়ী পরিপূর্ণ করিল। এক এক দল বাদ্যকর অন্যান্য দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত এক একজন প্রধান প্রধান উমরা আমিরের নিকট আপন আপন বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এদিকে রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড থাকিতে নহবতের বাদ্য আরম্ভ হইল। রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই নগরবাসী এবং রাজ প্রাসাদবাসিদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

নবাবের বড় অন্দরে তাঁহার স্ত্রী বাবু বেগম এবং জননী সায়দউন্নিসা বেগম বিশেষ হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাঁদিদিগকে গৃহ সুসজ্জিত করিতে আদেশ করিতেছেন। এদিকে তাঁহারা নিজে বিবিধ রত্নাভরণ এবং অতি মূল্যবান সুচারু বসন পরিধান পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইতেছেন।

আজ লক্ষ্ণৌ স্ত্রীপুরুষ আবাল বৃদ্ধ সকলেরই হর্ষোৎফুল্ল বদন, সকলেই নবাবের আগমন সংবাদে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু নবাব-

প্রাসাদবাসিনী তিনটী স্ত্রীলোক কোন প্রকার আমোদ আহ্লাদেই যোগ দিতেছেন না। অদ্যকার শুভদিন তাঁহাদের অন্তরে অন্য কোন প্রকার পরিবর্ত্তনই আনয়ন করে নাই। তাঁহারা পূর্ব্বদিনও যে ভাবে ছিলেন আজও সেই ভাবে সময়াতিপাত করিতেছেন।

এই তিন জনের মধ্যে একজনের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইয়াছে। ইনি যখন অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সম্পদের অধিকারিনী ছিলেন, তখনও সাংসারিক পদ প্রভুত্ব ইঁহাকে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সুখী করে নাই, বরং সাংসারিক সুখ সম্পদের, সাংসারিক ঐশ্বর্য্যের ক্রোড় ভ্রষ্টা হইয়াছেন পর এখন ইহার জীবনে দুঃখ কষ্ট প্রদ ঘটনা অত্যল্পই ঘটিয়া থাকে। ইহার বর্ত্তমান নাম জগদম্বা বেগম। ইনি বঙ্গের নবাব মীরজাফরের সহধর্ম্মিনী এবং মীর কাসিমের শ্বশ্রু।

দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকটীর বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইবে। ইনি পরমাসুন্দরী। দেখিতে কৃশাঙ্গী। ইহাঁর মুখ কমল বিমর্ষের ছায়ায় সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই বিষাদ পরিপূর্ণ মুখকমল হইতে ধর্ম্ম এবং পবিত্রতার জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। ইহাঁর হস্তে সর্ব্বদাই একখান কোরাণ থাকে। বিগত দশবৎসর যাবৎ কোরাণ পাঠ ভিন্ন ইহার অন্য কোন কাজ নাই। কখনও বৃদ্ধা জননীকে কোরাণ পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। কখন নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে কোরাণ পাঠ করিতেছেন। সমুদয় কোরাণখানি ইহার কণ্ঠস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে হাফেজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজ দিগের বাইবেলে যদ্রূপ লিখিত আছে, "Seek ye after Me and every thing shall be given unto you" অর্থাৎ আমাকে পাইতে চেষ্টা কর, আমার অনুসন্ধান কর, তবে পৃথিবীর সকলই তুমি পাইবে।" ঠিক এই প্রকার ভাব পরিপূর্ণ কিন্তু প্রকারান্তরে লিখিত কোরাণের একটী কথা ইনি প্রত্যহ এক একবার পাঠ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। সময় সময় নির্জ্জনে বসিয়া প্রাগুক্ত কথাটী পাঠ করিবার পর আপনা আপনি বলিতেন "হে পরমেশ্বর সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যখন ছিলাম তখন একবারও তোমাকে পাইবার চেষ্টা করি নাই। সম্পদ এবং ঐশ্বর্য্য যে গিয়াছে সে ভালই হইয়াছে"।

এই ধার্ম্মিকা রমনী বঙ্গের শেষ সুবাদার মুসলমানকুলতিলক মীর কাসিমের স্ত্রী, নবাব মীর জাফরের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

ইহাঁরা দুই জন ভিন্ন আর একটী রমণী অদ্যকার আনন্দোৎসবে যোগ প্রদান করেন নাই। ইনি সেই দেব বালা হাফেজ নন্দিনী। আজ প্রায় দশ বার দিন হইল পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় উজীরের প্রাসাদে মৌনব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক কালযাপন করিতেছেন। নবাবের অন্দরে প্রবেশ করিবার পর পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে ইনি কাহার সহিত একটী কথাও বলেন নাই। এখানে আসিবার পর ইহাঁর মধ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। যখন জননীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তখন ইহাঁর কথা বার্ত্তা ভাব ভঙ্গী দেখিলে সরলা বালিকা বলিয়া বোধ হইত। সংসারের ভাল মন্দ তখন কিছুই বুঝিতেন না। তখন ইহাঁর ব্যবহার এবং কার্য্যের মধ্যে পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকার সরলতা পরিলক্ষিত হইত। প্রত্যেক কার্য্য এবং ঘটনা উপলক্ষে জননীর উপর নির্ভর করিতেন।

কিন্তু লক্ষ্ণৌ আসিবার পর আর সে ভাব নাই। এখন ইহাঁর প্রত্যেক কার্য্য এবং ব্যবহারের মধ্যে এক জন প্রবীণা রমণীর ভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহাঁর পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিলে বোধ হয় যেন বিপদ একদিনের মধ্যে একটী পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকাকে প্রৌঢ়াবস্থা প্রদান করিয়াছে।

নহবতের বাদ্য এবং লোকের কোলাহলে আজ নবাব প্রাসাদবাসিনী রমণীগণ রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড থাকিতে জাগ্রত হইয়াছেন। কিন্তু হাফেজ নন্দিনীর এখনও নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। লক্ষ্ণৌ পৌছিবার পর এক রাত্রেও ইহাঁর সুনিদ্রা হয় নাই। কিন্তু আজ বিলক্ষণ নিদ্রা যাইতেছেন।

হাফেজ নন্দিনীকে জগদম্বা বেগম কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। সুতরাং তিনি জাগ্রত হইয়া নেমাজ পড়িবার পর ধীরে ধীরে হাফেজ নন্দিনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। হাফেজ নন্দিনী এখনও নিদ্রা যাইতেছেন। জগদম্বা বেগম জানিতেন যে, হাফেজ নন্দিনী লক্ষ্ণৌ আসিয়াছেন পর তাঁহার নিদ্রা হয় না। সুতরাং তাঁহাকে জাগ্রত না করিয়া, ধীরে ধীরে তাঁহার শিয়রে যাইয়া দাঁড়াইলেন। অনিমিষ নেত্রে তাঁহার সেই সরলতা এবং পবিত্রতা পরিপূর্ণ মুখ খানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। শায়িতাবস্থায় সেই অপরূপ রূপরাশির আধার হাফেজবালা এখন সত্য সত্যই জগদম্বার নিকট দেববালা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। জগদম্বার প্রগাঢ় ইচ্ছা হইল যে, তাঁহার মুখ কমল এখন একবার চুম্বন করেন।

কিন্তু পাছে হাফেজ নন্দিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়, সেই আশঙ্কায় আপন হৃদয়ের প্রগাঢ় বাসনা সম্বরণ পূর্ব্বক আবার একদৃষ্টে চহিয়া রহিলেন।

নিদ্রাবেশে এখন হাফেজনন্দিনীর মুখখানি একটু বিকৃত হইল। তিনি স্বপ্নাবেশে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও—বাবা আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

এই কয়েকটী কথা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্রই তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র দেখেন জগদম্বা বেগম তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে হাফেজ নন্দিনী লক্ষ্ণৌ পৌঁছিবার পর পাঁচ দিনের মধ্যে কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। কিন্তু চারি পাঁচ দিবস পরে তিনি জগদম্বা বেগম এবং তাঁহার কন্যার সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজ দুই দিন যাবত্‌ জগদম্বাকে মা বলিয়া, এবং তাঁহার কন্যাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

নিদ্রা ভঙ্গের পর জগদম্বাকে শিয়রে দেখিয়া হাফেজ নন্দিনী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মা! মা! বলিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। এবং সজল নয়নে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "মা! এতক্ষণ স্বপ্নে বাবার সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম। বাবা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।"

জগদম্বা বেগম হাফেজ নন্দিনীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে তিনি ক্রন্দন সম্বরণ পূর্ব্বক আবার বলিতে লাগিলেন,—

"মা, আজ সমস্ত রাত্র নানা প্রকার স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম। প্রথম রাত্রে দেখিলাম, একটা রাক্ষসাকৃতি পুরুষ আমাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত হা করিয়া আমার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। আমি তখন প্রাণের ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। কিন্তু রাক্ষস আমার নিকটে আসিবামাত্র আমার পশ্চাৎ হইতে আমার পিতা এবং আর এক জন বীর পুরুষ তাহাকে ধৃত করিলেন। সেই বীর পুরুষ রাক্ষসকে ধরাতলে ফেলিয়া তাহার বক্ষের উপর উপবেশন করিলেন। তখন আমার পিতা সেই বীর পুরুষের হস্তে এক খানি ছুরিকা প্রদান করিলেন। বীর পুরুষ সেই ছুরিকা রাক্ষসের বুকের মধ্যে প্রবিষ্ট করিলেন। অতি বিকট চীৎকারের পর রাক্ষসের মৃত্যু হইল।

"এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া, একবার জাগ্রত হইয়াছিলাম। জাগ্রতাবস্থায়ও

সেই রাক্ষসের আকৃতি স্মরণ হইবামাত্র আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। কিছুকাল শয্যোপরি বসিয়াছিলাম। তৎপর আবার নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলাম। অত্যল্পকাল মধ্যেই আমার নিদ্রা হইল। তখন আবার স্বপ্নে দেখিতে লাগিলাম, আমার পিতা সেই পূর্ব্বের বীর পুরুষকে সঙ্গে করিয়া, আমার নিকটে আসিয়া বসিলেন। বীর পুরুষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি ইহাঁকে পূর্ব্বে আর কখন দেখ নাই। তোমার জন্মিবার দীর্ঘকাল পূর্ব্বে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল। ইনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আলিমহম্মদ—তোমার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র। ইহাঁর দ্বারাই রোহিলা রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল।"

"পিতা এই কথা বলিবামাত্রই সেই বীরপুরুষ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক স্বর্গের দিকে চাহিয়া, এবং বামহস্ত দ্বারা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে পরমেশ্বর, যে মহৎ প্রতিহিংসার ভাবে আমার মন উত্তেজিত হইয়াছিল বলিয়া, আমি বাণিজ্যব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাংগ্রামিক জীবন অবলম্বন করিয়াছিলাম; যে মহৎ প্রতিহিংসা সর্ব্বদা আমার মনে জাগ্রত ছিল বলিয়া, আমি সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই উত্তেজিত হইয়া পড়িতাম; আজ আমার হৃদয় হইতে পিতৃবৈর নির্য্যাতনের সেই মহৎ প্রতিহিংসার ভাব এই পবিত্র বালিকার হৃদয়ে প্রবেশ করুক।"—

"আমি এই বীরপুরুষের কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি অবাক্ হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

"তখন আমার পিতা আমাকে বলিতে লাগিলেন "বাছা তোমার জ্যেষ্ঠতাত দাউদ খাঁর নাম তুমি কখন শুন নাই?"—

"আমি বলিলাম "আপনার মুখেই কতবার শুনিয়াছি।"

"বাবা আবার বলিতে লাগিলেন "কামাউনের রাজা অন্যায় পূর্ব্বক আমার সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা দাউদ খাঁর প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই, আলিমহম্মদ পিতৃবৈরনির্য্যাতনার্থ সাংগ্রামিক জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন। দাউদ খাঁর মৃত্যুই আলি মহম্মদের হৃদয়মন বীর রসে পরিপূর্ণ করিয়াছিল। আলিমহম্মদই রোহিলা রাজ্য সংস্থাপক। রোহিলখণ্ড বাসী কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই যেন আলিমহম্মদের পদানুসরণ করেন।"—

"এই বলিয়া আমার পিতা এবং সেই বীরপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। আমি

স্বপ্নাবেশে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "বাবা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। বাবা আমি তোমার সঙ্গে যাইব"।—

জগদম্বা স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। জগদম্বা বিশ্বাস করেন যে স্বপ্নে সময় সময় মৃত আত্মীয় স্বজন আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু হাফেজনন্দিনীকে আবার ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, স্বপ্নের কথা আর মনে স্থান দিলেন না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কুলক্ষণ।

জগদম্বা বেগম হাফেজ নন্দিনীর প্রকোষ্ঠে বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছেন। কিছু কাল পরে জগদম্বার কন্যা মীর কাসিমের পত্নী কোরাণ হস্তে করিয়া সেখানে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র হাফেজ নন্দিনী বলিলেন,—

"দিদি, আজ একবার আমার নিকট কোরাণ পাঠ কর। আমার মনে হইতেছে, যেন, সত্বরই আমাকে এ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

মীর কাসিমের স্ত্রী তখন কোরাণ খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন—

"সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইবে। চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও সুস্নিগ্ধ হইবে।"

মীর কাসিমের স্ত্রী এই কথাটী পাঠ করিবামাত্র হাফেজ নন্দিনী বলিলেন,

"দিদি, মানুষে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইবার প্রয়োজন কি? কেবল চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল এবং সুস্নিগ্ধ হইলেই ভাল হয়। চন্দ্রালোক দর্শনে সকলের হৃদয়ই আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। চন্দ্রের সুশীতল কিরণ সকলের মনেই শান্তি প্রদান করে। কিন্তু সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপ, সর্ব্বদাই অসহনীয় বলিয়া বোধ হয়।"

মীর কাসিমের স্ত্রী বলিলেন,—"সূর্য্যের তেজে সংসারের সকল প্রকার পাপ, দুর্নীতি এবং অত্যাচার বোধ হয় ভস্মীভূত হয়। আর চন্দ্রালোক পৃথিবীকে নির্ম্মল ও সুস্নিগ্ধ করে। সুতরাং পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য্য উভয়েরই

প্রয়োজন রহিয়াছে। সূর্য্যের তেজে সংসারের পাপ এবং দুর্নীতি বিনষ্ট না হইলে, চন্দ্রালোক পৃথিবীকে কিরূপে নির্ম্মল করিবে? পরমেশ্বর এই নিমিত্তই চন্দ্র সূর্য্য উভয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। আর রসুল এবং পয়গম্বরগণ মানুষকে চন্দ্র সূর্য্য উভয়ের প্রকৃতি লাভ করিতে বলিয়াছেন।"

হাফেজ-নন্দিনী বলিলেন, "দিদি, আমি চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল এবং সুস্নিগ্ধ হইতে ইচ্ছা করি। সূর্য্যের তেজ আমার ভাল বোধ হয় না। তুমি এখন যে কথা পাঠ করিলে, এই কথা বাবা কতবার আমার নিকট পাঠ করিয়াছেন। বাবার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সের সময় আমার জন্ম হইয়াছে। আমি তাঁহার শেষ সন্তান। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে ক্রোড়ে করিয়া রাখিতেন। আমি বড় হইয়াও বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। বাবা বলিতেন, চন্দ্রের মৃদুতা বালিকা জীবন সুশোভিত করে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সূর্য্যের তেজেরই অধিক প্রয়োজন।

"দিদি, এ কথা কি সত্য? কেবল বাল্যকালে চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হইতে হয়, আর বয়স হইলে সূর্য্যের ন্যায় প্রখর হইতে হইবে? কত বৎসর বয়স হইলে সূর্য্যের তেজ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে? আমার এখন ষোল বৎসর বয়স হইয়াছে।"

মীর কাসিমের স্ত্রী বলিলেন, "তুমি আজ এত আগ্রহাতিশয় সহকারে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? আজ তোমার কথা বার্ত্তা এবং ব্যবহারে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। তোমার কি হইয়াছে বল দেখি?"

হাফেজনন্দিনী, বলিলেন, "আজ শেষ রাত্র হইতে আমার মনে হইতেছে, যেন, বাবা আমাকে তাঁহার নিকটে যাইতে বলিতেছেন। বাবাকে রাত্রে দুই বার স্বপ্নে দেখিয়াছি। বোধ হয় আমাকে আজই এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

হাফেজ নন্দিনীর এই সকল কথা শুনিয়া জগদম্বার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল। জগদম্বা বেগম সংসারের সমুদয় কার্য্য কলাপের মধ্যেই ঈশ্বরের হস্ত নির্দ্দেশ করিতেন। তাঁহার মন স্বভাবতঃই অত্যন্ত ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল। সংসারের প্রত্যেক ঘটনা এবং প্রত্যেক কার্য্যের মূলে একটা না একটা কারণ রহিয়াছে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কোন বিষয়ের কার্য্য কারণ শৃঙ্খল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যখন কোন

কারণ অবধারণ করিতে অসমর্থা হইতেন, তখন মনে করিতেন যে, ঈশ্বরের মঙ্গল হস্তই ইহার মূলে নিহিত রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "মানুষ ঈশ্বরের হস্তের পুত্তলিকা। এ সংসারে তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না।"

প্রাতঃকালে হাফেজ নন্দিনীর স্বপ্নের কথা শুনিয়াই জগদম্বা মনে মনে নানা চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু এখন আবার তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া, তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আজ এই পিতৃহীননিরাশ্রয়া বালিকার নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘটিবে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যে উজীর সুজাউদ্দৌলা আজ বাড়ী আসিবেন। হয় তো তাঁহার আগমনেই এই নিরাশ্রয়া বালিকার কোন ঘোর অনিষ্ট হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি সুজাউদ্দৌলার জননী সায়দউন্নিসা বেগম এবং সুজার স্ত্রী বহুবেগমের নিকট চলিয়া গেলেন।

মীর কাসিমের স্ত্রী হাফেজ নন্দিনীর প্রকোষ্ঠে বসিয়া তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

সায়দ উন্নিসা বেগম এবং বহু বেগম উভয়ে অন্দরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত বাঁদীদিগকে হুকুম করিতেছেন। পাঠকদিগের পূর্ব্ব পরিচিতা প্রেমিকা তোফানী, এবং এরফানী প্রভৃতি আর দশ বার জন বাঁদী বিশেষ উৎসাহের সহিত সেখানে কার্য্য করিতেছে।

বাঁদীগণের মধ্যে কেহ স্বর্ণ নির্ম্মিত ঝাড়, ফুলদান, আতরদান, ইত্যাদি মূল্যবান গৃহ সামগ্রী পরিষ্কার করিতেছে। কেহ মণিমুক্তা মণ্ডিত বিবিধ সখের জিনিস প্রকোষ্ঠ মধ্যে যথাস্থানে সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেছে।

জগদম্বা প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলে পর শাশুড়ী এবং পুত্রবধূ বিশেষ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। তিনি আসন গ্রহণানন্তর বহু বেগম এবং সায়দ উন্নিসা বেগমকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনাদের দুই জনের নিকট আমি একটী কথা বলিতে আসিয়াছি। আমার একটী অনুরোধ রাখিবেন কি?"

সায়দউন্নিসা অতি ভদ্রবংশজাতা রমণী। নবাব জাফরালীর স্ত্রী রাজ্যভ্রষ্টা হইয়া তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। জগদম্বার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে

তিনি বলিলেন, "আপনার অনুরোধ আমি অবশ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব।"

তখন জগদম্বা বলিতে লাগিলেন, "আজ নবাব সুজা বাড়ী আসিবেন। তিনি হয়তো কোন অসদ্ অভিপ্রায়ে হাফেজ নন্দিনীকে এখানে আনিয়াছেন। কেবল বন্দীস্বরূপ কয়েদ রাখিবার নিমিত্ত ইহাকে আনিলে, নিশ্চয়ই ইহার জননীর সঙ্গে ইহাকে আলাহাবাদে প্রেরণ করিতেন। আমি অনুরোধ করি, আপনারা সুজার অজ্ঞাতে ইহাকে স্থানান্তরে কোথাও প্রেরণ করুন। আমার মনে হইতেছে যে, হাফেজ নন্দিনী এখানে থাকিলে তাহার বিশেষ কোন অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। আমি আজ অনেক কুলক্ষণের কারণ দেখিতেছি।

সায়দউন্নিসা। সুজা নিশ্চয়ই ইহাকে নিকা করিবার অভিপ্রায়ে এখানে পাঠাইয়াছেন। নহিলে ইহার মাতার সঙ্গে ইহাকে আলাহাবাদে প্রেরণ করিতেন।

জগদম্বা। কিন্তু হাফেজ নন্দিনী বোধ হয় সুজাকে নিকা করিতে কখনও সম্মত হইবেন না।

সায়দউন্নিসা। স্ত্রী লোকের আবার একটা সম্মতি অসম্মতি কি? বন্দীস্বরূপ যখন সুজার হাতে পড়িয়াছে, তখন সুজা উহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন।

জগদম্বা। আপনি হাফেজ কন্যাকে সামান্যা স্ত্রীলোক বলিয়া মনে করিবেন না। সুজা বলপূর্ব্বক তাহাকে নিকা করিতে চাহিলে, সে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবে।

সায়দউন্নিসা। আত্মহত্যা যে করিবে, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু তাহা হইলেই বা আমরা কি করিতে পারি। এখন কি আমি পুত্রের সঙ্গে এই জন্য বিবাদ করিব?

জগদম্বা। স্ত্রীলোকের প্রাণ অপেক্ষাও ইজ্জাৎ বড়। এই পিতৃহীনা দুরবস্থাপন্না যুবতীর ইজ্জাৎ রক্ষার্থ আপনাদের দুই জনেরই চেষ্টা করা উচিত। আপনারা এখনই ইহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করুন।

সায়দউন্নিসা। সুজার অজ্ঞাতে ইহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলে, সুজা আমাদিগের প্রতি যার পর নাই কোপাবিষ্ট হইবেন।

জগদম্বা। তিনি কোপাবিষ্ট হইলেই বা কি? তিনি তো আর আপনাদের প্রাণদণ্ড করিতে পারিবেন না?

সায়দউন্নিসা। সুজার সঙ্গে বিবাদ করিলে কি আর আমাদের রক্ষা আছে? এখনই আমাদের সমুদয় অর্থসম্পত্তি বলপূর্ব্বক হরণ করিবেন। আমাদিগের জায়গীর হইতে আমাদিগকে বেদখল করিবেন। আমরা কি সুজার সঙ্গে বিবাদ করিতে পারি?

জগদম্বা। এ সংসারের ধন সম্পত্তি সকল সময়েই বিনষ্ট হইতে পারে। কেবল টাকা এবং জায়গীরের নিমিত্ত এই কর্ত্তব্য প্রতিপালনে বিরত থাকিবেন না। আপনারা স্ত্রীলোক হইয়া এই নিরাশ্রয়া পিতৃহীনা বালিকাকে রক্ষা না করিলে, ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট আপনাদিগকে দায়ী হইতে হইবে।

সায়দউন্নিসা। কোন নবাব কোন স্ত্রীলোককে নিকা করিবার ইচ্ছা করিলে, তাঁহার মাতা কিম্বা স্ত্রী কি কখনও তাঁহাকে এইরূপ কার্য্য হইতে বিরত রাখিতে পারেন? আপনি কখন শুনিয়াছেন, কিম্বা দেখিয়াছেন, যে কোন নবাবের মাতা কিম্বা স্ত্রী তাহাকে এইরূপ কার্য্য হইতে বিরত রাখিতে সমর্থা হইয়াছেন?

জগদম্বা। কেবল শুনিব কেন? আমি নিজেই আপন গর্ভজাত কুপুত্র নবাব * নসিরাল্ মুলুকের হস্ত হইতে অনেকানেক স্ত্রীলোককে রক্ষা করিয়াছি। আপনি যদি পুত্রের মঙ্গল কামনা করেন, তবে তাহাকে এ কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করুন। দুর্ব্বৃত্ত নসিরাল্ মুলুকের লোকেরা তিনটী ব্রাহ্মণ কন্যাকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিল। সেই ব্রাহ্মণ কন্যাত্রয়ের মধ্যে বয়োধিকা রমণী নসিরাল্ মুলুককে অভিসম্পাত পূর্ব্বক বলিল, যে, বিনা মেঘে বজ্রপাত হইয়া ইহার মৃত্যু হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণ কন্যার বাক্য নিস্ফল হইল না। বিনা মেঘে বজ্রাপাত হইয়াই মীরণের মৃত্যু হইল। সে ব্রাহ্মণ কন্যার কথা বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আমার এতদূর শ্রদ্ধা হইয়াছিল, যে তাঁহার নামানুসারেই আমি জগদম্বা নাম ধারণ করিতেছি।"

বহুবেগম জগদম্বার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনি একটা কাফেরি নাম গ্রহণ করিলেন কেন?"

জগদম্বা বলিলেন, "কাফের বলিয়া হিন্দুদিগকে ঘৃণা করিবেন না। নবাব আলিবর্দ্দির ন্যায় বুদ্ধিমান লোক নবাবদিগের মধ্যে আর কেহই ছিল না।

* মীরজাফরের পুত্র মীরণের নাম নবাব নসিরাল্ মুলুক্।

সেই আলিবর্দ্দি একজন বৃদ্ধ কাফের পণ্ডিতের পরামর্শানুসারে সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সে পণ্ডিতকে তিনি আপন খাস-নবী বলিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে কেবল আলিবর্দ্দিই এক স্ত্রীতে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার একটি ভিন্ন দুইটী স্ত্রী ছিল না। তাঁহার দ্বিতীয় অন্দর ছিল না। আলিবর্দ্দির সেই বৃদ্ধ পণ্ডিতের মুখে আমি অতি শৈশবাবস্থায় তিনটী কথা শুনিয়া ছিলাম। সেই তিনটী কথা বাল্যকাল হইতে আজপর্য্যন্ত আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আজীবন সে কথা কয়েকটী স্মরণ থাকিবে। নবাবগণ যদি নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে ইচ্ছা করেন, বেগমেরা যদি আপন আপন স্ত্রীধর্ম্ম পালন করিতে চাহেন, জননী যদি সুপুত্র লাভ করিতে বাসনা করেন, তবে সেই কাফের পণ্ডিতের উপদেশ তিনটীই প্রতিপালন করিতে হইবে। বুদ্ধিমান নবাব এবং বাদসাহগণ হিন্দুদিগকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করেন না। আকবর্ এবং আলিবর্দ্দিই ইহাঁদিগের মহত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন।"

জগদম্বার বাক্যাবসানে সায়দউন্নিসা এবং বউবেগম উভয়ই অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,-"কাফের পণ্ডিত কি তিনটী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন?"

জগদম্বা বলিলেন, "তাঁহার সেই উপদেশের কথা বলিতে হইলে, আমার জীবনের সমুদয় ঘটনা বলিতে হয়। তাঁহার মুখে যে তিনটী কথা শুনিয়াছিলাম, সে তিনটী কথাই আমার জীবনে ফলিয়াছে।"

অযোধ্যার বেগমদ্বয় বিশেষ আগ্রহাতিশয় সহকারে জগদম্বাকে সেই সকল কথা বলিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি আত্মবিবরণ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কাফেরের তিন উপদেশ।

জগদম্বা আত্মবিবরণ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন,—"আমার পিতা আলিবর্দ্দিখাঁর একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। আলিবর্দ্দির

সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই কোন এক সংগ্রাম উপলক্ষে তাঁহার মৃত্যু হইল। আলিবর্দ্দির স্ত্রী অত্যন্ত সহৃদয়া পুণ্যবতী ছিলেন। তিনি আমাকে এবং আমার জননীকে আপন গৃহে আশ্রয় প্রদান করিলেন। দুই বৎসর পরে আমার জননীরও মৃত্যু হইল। তখন আলিবর্দ্দির স্ত্রীই আমাকে জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

"ইহার কয়েক বৎসর পরে আলিবর্দ্দি বঙ্গের সুবাদার হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘেসিতি বেগমের এবং আমার প্রায় এক সমান বয়স ছিল। তিনি আমাকে ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতেন। ঘেসিতি বেগম ভিন্ন আলিবর্দ্দির আর দুই কন্যা ছিল। আমরা চারিজনেই চারিটী ভগ্নীর ন্যায় একত্রে আহার বিহার করিতাম। আলিবর্দ্দি খাঁ যখন খাস্ দরবারে তাঁহার বৃদ্ধ পণ্ডিতকে লইয়া বসিতেন, তখন সময়ে সময়ে আমরা চারি ভগ্নীই সেখানে যাইয়া বসিতাম। সেই বৃদ্ধ পণ্ডিত এবং নবাব আলিবর্দ্দি আমাদিগকে লইয়া অনেক আমোদ আহ্লাদ করিতেন। পণ্ডিতও আমাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু মুখে সর্ব্বদাই হাস্য পরিহাসের কথা বলিতেন।

"এক দিন সেই বৃদ্ধ পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে, আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'তোমরা চারি জন আমাকে বিবাহ করিবে?'

"আমরা তখন তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম। কিন্তু ঘেসিতি বেগম বাল্য কাল হইতেই বড় মুখরা ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'পণ্ডিত, আমাদিগকে বিবাহ করিলে তোমার জাতি যাইবে।"

"পণ্ডিত আবার হাস্য করিয়া বলিলেন, 'তোমাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া, তোমাদিগকে বৈষ্ণবী করিব।'

"আলিবর্দ্দি বলিলেন, 'আমার কন্যা বৈষ্ণবী হইবে কেন?'

"ইহার প্রত্যুত্তরে পণ্ডিত বলিলেন—'না, বৈষ্ণবী হইবে না, কিন্তু বেশ্যা হইতে হইবে। বৈষ্ণবী এবং বেশ্যার এক প্রকারই ধর্ম্ম। তবে বৈষ্ণবী হইলে সমাজে কোন গ্লানি থাকে না। তাই তোমার উপকারার্থ এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম।'

"আলিবর্দ্দি আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আমার কন্যা বেশ্যাই বা হইবে কেন? ইহারা সকলেই নবাবের বেগম হইবেন।'

"পণ্ডিত বলিলেন, 'নবাবের বেগমদিগকেই আমি বেশ্যা বলিয়া মনে

করি। তবে আপনার বেগমই কেবল স্ত্রীধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে কৃত-কার্য্য হইয়াছেন।'

"আলিবর্দ্দি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নবাবের বেগমদিগকে আপনি এত ঘৃণা করেন কেন?'

"তখন পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন,—'যে স্ত্রী আপনার স্বামীর হৃদয় মন সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করিতে অসমর্থা, যাঁহার স্বামীর মন পরস্ত্রী দর্শনে আকৃষ্ট হয়, তিনি স্ত্রী-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মপত্নী আপন স্বামীর মন এতদূর অধিকার করেন, যে, তাঁহার স্বামীর মন অন্য স্ত্রী দর্শনে কখনও আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু নবাবের বেগমগণ নবাবদিগের মন সেই প্রকার বান্ধিয়া রাখিতে অসমর্থা। সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্মপত্নী নহেন। তাঁহারা নবাবদিগের বেশ্যা।'

"পণ্ডিতের এই কথাটী আমার মনে একেবারে মুদ্রিত হইয়া পড়িল। আমি মনে করিতে লাগিলাম যে, পণ্ডিত যথার্থ কথাই বলিয়াছেন।

"ইহার পর আর এক দিন নবাব আলিবর্দ্দির সঙ্গে পণ্ডিত দেখা করিতে আসিলেন। আমরাও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

"আলিবর্দ্দি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, পরমেশ্বর তাহাকে সকল সুখ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু পুত্র মুখ দর্শন-সুখ হইতে ঈশ্বর তাঁহাকে বঞ্চিত রাখিয়াছেন।

"বৃদ্ধ পণ্ডিত এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 'ধর্ম্মগুরু কবীর বলেন, পুত্‌ আর মুত্‌ একস্থান হইতে আসিতেছে, যে পুত্‌ পিতা মাতার মুখ উজ্জ্বল করিতে অসমর্থ সে পুত্‌ নহে সে মুত্‌।'

"পণ্ডিতের এই কথাটীও আমার বড়ই মনে লাগিল। ইহার পর আর এক দিন আলিবর্দ্দির সঙ্গে কথা বলিবার সময় পণ্ডিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবাবদিগের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—দেশের রাজাকে যদি প্রজাগণ ভক্তি শ্রদ্ধা না করে; রাজাকে আপন প্রভুত্ব রক্ষার্থ যদি সর্ব্বদাই সৈন্য রাখিতে হয় তবে সে রাজা, রাজা নহে, সে দস্যু।'

"পণ্ডিতের এই তিনটী কথাই আমার মনের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া পড়িল। আমি সর্ব্বদাই মনে মনে বলিতাম, "স্ত্রী স্বামীর মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে না পারিলে তিনি ধর্ম্ম পত্নী নহেন—তিনি বেশ্যা। রাজা, প্রজাসমষ্টির ভক্তি আকর্ষণ করিতে না পারিলে তিনি দস্যু। পুত্র, পিতা

মাতার মুখ সমুজ্জল করিতে না পারিলে সে পুত্র নহে সে মুত্র।” রাত্রে শয়ন করিয়াও এই তিনটী কথা চিন্তা করিতাম। আলিবর্দ্দির কন্যা ঘেসিতি বেগম প্রভৃতি ও এই সকল কথা পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এই সকল কথা যখন শুনিলেন তখন একটু হাস্য করিলেন। আমার ন্যায় তাঁহাদের মনে এই সকল কথা বদ্ধমূল হইয়া পড়িল না।

“ইহার কিছুকাল পরে আলিবর্দ্দির ভ্রাতুস্পুত্র আহম্মদ জঙ্গের সঙ্গে ঘেসিতি বেগমের বিবাহ হইল। আহম্মদ জঙ্গের অপর নাম নিবাইশ মহম্মদ। তিনি ইহার পরে ঢাকার নবাবের পদে নিযুক্ত হইলেন। ঘেসিতি বেগমের বিবাহের পর, আলিবর্দ্দির আর দুই কন্যারও বিবাহ হইল। আমার বিবাহের প্রস্তাব হইলেই আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইত। পণ্ডিতের সেই কথা স্মরণ হইলে, আর বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইত না। মনে করিতাম, যে, যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে, তিনিই আর পঁচিশটা বিবাহ করিবেন। আলিবর্দ্দি খাঁর ন্যায় এক স্ত্রীতে অনুরক্ত এমন লোক কোথাও মিলিবে না। কিন্তু লজ্জায় মনের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতাম না।

“মীরজাফর আলিবর্দ্দির প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি আমাকে বিবাহ করিলে আলিবর্দ্দি খাঁর প্রিয় পাত্র হইতে পারিবেন, এই মনে করিয়া আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁও তাহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু আমি মনে মনে বড় কষ্টানুভব করিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম যে মীরজাফর কি আর বিশ পঁচিশটা বিবাহ করিবেন না? ইহার সঙ্গে বিবাহ হইলেও আমাকে ইহার বেশ্যা হইতে হইবে। কিন্তু মনের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেও সাহস হইত না। অবশেষে ঘেসিতি বেগমের নিকট বলিলাম ‘দিদি! সে পণ্ডিতের কথা তোমার স্মরণ নাই? সে পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, যাহারা বহু বিবাহ করে, তাহাদিগের পত্নী হইলে বেশ্যা হইতে হয়। যে এক স্ত্রীর অধিক বিবাহ করিবে তাহাকে আমি বিবাহ করিব না।’

“ঘেসিতি বেগম আমার কথা শুনিয়া, হি হি করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বহু বিবাহ নবাব, আমির, উমরাদিগের মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রচলিত। সুতরাং তিনি আমাকে পাগল বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, এবং আমার সকল কথা তাঁহার স্বামীর নিকট বলিলেন। তাঁহার স্বামী আহম্মদ জঙ্গ এই কথা লইয়া আপন বয়স্যদিগের সঙ্গে আমোদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে

আমার এই কথা আলিবর্দ্দি এবং তাঁহার স্ত্রীর কর্ণেও প্রবেশ করিল। আমি মনের কথা প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত লজ্জায় পড়িলাম। মেয়েদিগের মধ্যে সকলেই আমাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল; সকলেই আমাকে একটা পাগলিনী বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

"কিন্তু আলিবর্দ্দির ন্যায় বিচক্ষণ লোক মুর্শিদাবাদে আর কখনও রাজত্ব করেন নাই। অন্য লোকে আমার কথা শুনিয়া ঠাট্টা তামাসা করিত, তিনি বরং আমার প্রশংসা করিতেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট বলিলেন, "মেহের যদি মীরজাফরকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা না করে, তবে মীরজাফরের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।"

"আমার বাল্য কালের নাম মেহেরউন্নিসা ছিল। আলিবর্দ্দি আমাকে সস্নেহে মেহের বলিয়া ডাকিতেন।

"আলিবর্দ্দি আহম্মদ জঙ্গকে ডাকিয়া বলিলেন 'মেহের মীরজাফরকে বিবাহ করিতে অসম্মতা হইয়াছেন। অতএব মীরজাফরের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইবে না।'

"মীরজাফর আহম্মদ জঙ্গের অতিপ্রিয় পাত্র ছিলেন। আহম্মদ জঙ্গ আলিবর্দ্দিকে বলিলেন, 'মেহের জাফরকে বিবাহ করিতে কেন অসম্মতা হইবেন? এই সকল হাসি তামাসার কথা শুনিয়া আপনি কি ইহা সত্য সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন?'

"আহম্মদ জঙ্গ আলিবর্দ্দি খাঁর নিকট এই কথা বলিয়াই অন্দরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার স্ত্রী দ্বারা আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমার তখন সতের আঠার বৎসর বয়স হইয়াছে। আমি বাল্যকালে আহম্মদ জঙ্গ প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে খেলা করিয়াছি। কিন্তু পনের ষোল বৎসর বয়স হইবার পর আর তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতাম না। আমি পর্দ্দার অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন আহম্মদ জঙ্গ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'মেহের, যাহারা বহু বিবাহ করে তুমি তাহাদিগকে বিবাহ করিবে না বলিয়াই, বৃদ্ধ নবাব (অর্থাৎ আলিবর্দ্দি খাঁ) মীরজাফরের সঙ্গে তোমার বিবাহ সাব্যস্ত করিয়াছেন। এ মুর্শিদাবাদে দুই জন লোক আছেন, যাঁহারা বহু বিবাহে রাজি নহেন। এক জন বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ। আর এক জন মীরজাফর। তুমি তবে মীরজাফরকেই বিবাহ কর।'

"আহম্মদ জঙ্গ বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত এই কথা বলিলেন। আমি তাঁহার কথা সত্য বলিয়া মনে করিলাম এবং অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত মীরজাফরকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলাম। আহম্মদ জঙ্গের চাতুরি তখন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।—তিনি আমাকে এই কথা বলিয়া বাহিরে যাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

"কয়েক দিবস পরে মীরজাফরের সঙ্গে আমার বিবাহ হইল। কিন্তু আমার বিবাহের পর তিন মাসের মধ্যে মীরজাফর অন্যূন বিশ পঁচিশটী স্ত্রীলোককে নিকা করিলেন। প্রথমতঃ আমার অত্যন্ত আত্মগ্লানি হইতে লাগিল। কিন্তু কলঙ্ক এবং পাপের মধ্যে শরীর একবার ঢালিয়া দিলে, আর পাপকে পাপ বলিয়া বোধ হয় না, কলঙ্ককে কলঙ্ক বলিয়া বোধ হয় না। ছয় মাসের মধ্যে আমার বাল্যসংস্কার একেবারেই দূর হইল। বহু বিবাহের প্রতি আর কোন ঘৃণা রহিল না। ইহার পর ঘেসিতি বেগমের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হইত, তখনই তিনি পরিহাস করিয়া, আমাকে বলিতেন 'মীরজাফর তো বহু বিবাহ করে নাই? তোমাকে ত বেশ্যা হইতে হয় নাই?' আমিও তখন হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতাম না। তখন মনে করিতাম, বাল্যকালে সেইরূপ সংস্কার মনে স্থান প্রদান করিয়া নিতান্ত পাগলের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলাম।

"আমার বিবাহের প্রায় পনের ষোল বৎসর পরে আলিবর্দ্দির মৃত্যু হইল। সিরাজ বঙ্গের নবাব হইলেন। কিন্তু সিরাজের সিংহাসন প্রাপ্তির প্রায় বৎসরেক পরে একদিন অপরাহ্নে বস্ত্রাবৃত একখানা পাল্কী আমাদের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, আমি মনে করিলাম সিরাজের প্রাসাদ হইতে কোন স্ত্রীলোক হয় তো আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। আমি দ্বিতল গৃহ হইতে নীচে আসিলাম। গৃহ দ্বারে আমার সেই কুপুত্র মীরণ দাঁড়াইয়াছিল। মীরণ আমাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু সেই পাল্কীর মধ্য হইতে একটা যমদূতের ন্যায় দাড়ীওয়ালা *ইংরাজকে বাহির

* It still remained necessary that Meer Jaffer should take an oath to observe the treaties. Mr. Watts therefore proposed an interview, which Jaffer wished likewise. * * * Mr. Watts relying on the fidelity of his own domestics, and on the manners of the country, went in the afternoon from his house in covered planquin such as carry woman of distinction, and passed without interruption to Jaffer's palace, who with his son Meerun received him in one of the apartment of the Seraglio.—Orme's History of Indoostan, Vol. II., page 160.

হইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটা ইংরাজ আমাদের অন্দরের মধ্যে কেন আসিয়াছে ইহার কোন মর্ম্মাবধারণ করিতে পারিলাম না। মীরণ এবং আমার স্বামী সেই ইংরাজটাকে সঙ্গে করিয়া যে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, আমি অদৃশুভাবে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে যাইয়া দাঁড়াইলাম। ইহাদিগের পরস্পরের কথাবার্ত্তা সহজে বুঝিবার সাধ্য ছিলনা। সকল কথার অর্থ বুঝিতেও পারিলাম না। কিন্তু আমার স্বামী যে কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন, তাহা দেখিতে পাইলাম। ইহাদের অন্যান্য কথাবার্ত্তা দ্বারা আমি সহজেই অনুমান করিলাম, যে, সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার পরামর্শ হইতেছে।

"আমার স্বামী তখন সিরাজের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ভৃত্য হইয়া আপন প্রভুর সঙ্গে এইরূপে বিশ্বাস ঘাতকতা করা অপেক্ষা আর কি গুরুতর পাপ হইতে পারে? আমি এই কুকার্য্য হইতে ইহাদিগকে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে মীরণকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলাম,—'বাছা! আমি তোমাদের সমুদয় দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়াছি। হয় তোমরা এ দুরভি-সন্ধি পরিত্যাগ কর, নহিলে আমি সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিব।'

"আমার স্বামী মীরজাফর তখন আমার শিরশ্ছেদন করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু নিতান্ত জঘন্য পশুরও বোধ হয় জননীর নিমিত্ত একটু স্নেহ থাকে। মীরণ আমার স্বামী অপেক্ষা সহস্রগুণে নিষ্ঠুর হইলেও সে আমার শিরশ্ছেদনে সম্মত হইলনা। তাহারা পিতা পুত্র উভয়ই আমাকে ধমকাইয়া বলিল, এ কথা প্রকাশ করিলে তৎক্ষণাৎ আমার শিরশ্ছেদন করিবে।

"আমিও মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, যে, সিরাজের নিকট এই কথা প্রকাশ করিলে, সে তৎক্ষণাৎই আমার স্বামী পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিবে। সিরাজ যদি ক্ষমাশীল হইত; এবং সে আমার অনুরোধে আমার স্বামী পুত্রকে ক্ষমা করিবে, আমার যদি এইরূপ আশা থাকিত; তবে নিশ্চয়ই আমি স্বামী পুত্রের এ সকল দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া, সিরাজের জীবন রক্ষা করিতাম। কিন্তু এ সংসারে যাহাদের ক্ষমা নাই, তাহারা নিতান্ত দুর্ভাগ্য। তাহারা অন্য লোককে তাহাদের সাহায্য করিবারও সুযোগ প্রদান করে না।

"অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এ সম্বন্ধে আমি নির্ব্বাক রহিলাম। ইহার কয়েক মাস পরে সিরাজ সিংহাসনচ্যুত হইলেন। আমার স্বামী বঙ্গের নবাব হইলেন।

"কিন্তু রাজা হইয়া, কিম্বা প্রধান রাজপুরুষ হইয়া, যে ব্যক্তি প্রজার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে অসমর্থ, তাহার ন্যায় হতভাগ্য লোক এসংসারে আর কেহই নাই। যে দীন হীন কাঙ্গাল দিনান্তে অতি-কষ্টে এক সন্ধ্যা আহারের সংস্থান করিতেও অসমর্থ তাহার অন্তরেও সময়ে সময়ে সুখের উদয় হইতে পারে। কিন্তু প্রজা সাধারণের বিরাগভাজন নরাধম রাজা কিম্বা রাজপুরুষকে বোধ হয় পরমেশ্বরই সকল সুখ হইতে বঞ্চিত রাখেন।

"মীরজাফর বঙ্গের নবাব হইবার পর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তখন এই রাজপদ রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার স্বামী এবং কুপুত্র মীরণ অহর্নিশ কেবল নরহত্যা করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করিতে লাগিল।

"সেই সময়ের ভয়ানক অবস্থা আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইলে আমার হৃদয় বিকম্পিত হয়। রাজা প্রজাসাধারণের বিরাগ ভাজন হইলে সকলের প্রতিই তাহার সন্দেহ উপস্থিত হয়। সে হতভাগ্য রাজা আর কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। মীরজাফর এবং মীরণ, উভয়েরই এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। তাহারা সন্দেহ করিয়া প্রত্যেক দিনই গোপনে দুই চারিটা লোকের প্রাণ বিণাশ করিতে লাগিল।

"দুর্ব্বৃত্ত মীরণ এক জন দীর্ঘ কালের বিশ্বস্ত ভৃত্য এবং নবাব সরকারের প্রধান বক্সী খাজে হাজিকে * সন্দেহ করিয়া তাহার প্রাণ বধ করিল। দ্বিতীয় বক্সি মীর কাজেম্ † আমার মাতুল হইতেন। মীরজাফর এবং মীরণের তাঁহার প্রতিও সন্দেহ হইল। তাঁহাকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া গোপনে গৃহ দ্বারে তাহার শিরচ্ছেদন করিল।

* Coja Haddee, the first Buxy, first banished for pretended conspiracy against the Nabab's life and afterwards cut off at Shabad in his march out of the Province.—Original papers relative to the Disturbances in Bengal. Vol. I., page 63.

† Meer Cazim, the second Buxy, invited by the Chota Nabab to his house and, after having received from him unusual marks of affection, assassinated at the gatesof the palace.—*Original papers relative to the Disturbances in Bengal. Vol. I., page 63.*

"ইহার কয়েক দিবস পরে আবার এমারতের দারোগা * ইয়ার মহম্মদ এবং অপর একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য আবদুল † ওয়াহেব খাঁর প্রাণ বিনাশ করিল।

"তোমাদিগের নিকট অধিক কি বলিব। দিন দিন এই প্রকার নরহত্যা এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার দর্শনে, স্বামী পুত্রের প্রতি আমার অত্যন্ত ঘৃণা উপস্থিত হইল। আমি তখন মনে মনে চিন্তা করিতাম যে, বাল্যকালে আলিবর্দ্দির পণ্ডিতের মুখে যে তিনটী কথা শুনিয়া ছিলাম, তাহা সমুদয়ই আমার অদৃষ্টে ফলিল। বোধ হয় আমার অদৃষ্টে এইরূপ ঘটিবে বলিয়াই ঐ কথা কয়েকটী আমার মনে তদ্রূপ বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। আলিবর্দ্দির কন্যাত্রয়ও এই সকল কথা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তো সত্বরই এই সকল কথা বিস্মৃত হইলেন, তাঁহাদিগের মনে তো এ সকল কথা বদ্ধমূল হইয়া পড়িল না।

"আমার মনে তখন দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, মীরজাফরকে বিবাহ করিয়া আমি স্ত্রীধর্ম্ম পালনে অসমর্থা হইয়াছি। সুতরাং আমি ধর্ম্মপত্নী নহি আমি বেশ্যা। মীরণকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমি পুত্র লাভ করিতে পারি নাই। মীরণ পুত্র নহে সে মূত্র। আর আমার স্বামী রাজা হইয়া প্রজার শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং তিনি রাজা নহেন, তিনি দস্যু।

"মীরজাফরের রাজ্যলাভ আমাকে সুখী করিতে সমর্থ হইল না। আমি সর্ব্বদা মনো দুঃখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম। কিন্তু প্রাগুক্ত ঐ সকল নরহত্যার পূর্ব্বে মীরণ যে ভীষণ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিল, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেই আমি অস্থির হইয়া পড়ি। সেই জন্য সে কথা এপর্য্যন্ত তোমাদিগের নিকট বলি নাই।

"আমার স্বামীর সিংহাসন প্রাপ্তির কয়েক মাস পরে তিনি মীরণের

---

* Yar Mahmud, formerly in great favour with the Nabab Serajah Dowlah, and since Drogali of the Emarut, slain in the presence of the Chata Nabab.—*Original Papers Relative to the Disturbances in Bengal. Vol. I., page 63.*

† Abdal Ohab Cawn murdered at the Rumna, by some of the horcurahs belonging to Checon, (who was a favourite of Meer Jaffer).—*Original Papers Relative to the Disturbances in Bengal. Vol. I., page 63.*

হস্তে মুর্শিদাবাদের রাজ কার্য্যের ভার প্রদান করিয়া, রায়দুর্ল্লভ এবং মেদেনীপুরের রাজা রামরাম সিংহের সঙ্গে কি বন্দোবস্ত উপলক্ষে কলিকাতা কিম্বা বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কোথায় গিয়াছিলেন, এবং কি কার্য্যোপলক্ষে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন, তাহা আমি বিশেষ রূপে জানিতাম না। আমার সহিত তাঁহার বড় একটা সাক্ষাৎ হইত না।

"এই সময় এই প্রকার জনরব * উঠিল যে, দিল্লীর বাদসাহ আমার স্বামীকে সুবাদারের পদে নিযুক্ত করিতে অসম্মত হইয়াছেন; তিনি সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র এক বৎসর বয়স্ক শিশু মির্জ্জা মেন্দিকে বঙ্গের সুবেদারী প্রদান করিয়া, রায়দুর্ল্লভকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন। এই জনরব মুর্শিদাবাদে পৌঁছিবামাত্র, রাত্রে দুর্বৃত্ত মীরন এক বৎসর বয়স্ক শিশু মির্জ্জা মেন্দির প্রাণ সংহারার্থ কয়েক জন দস্যু প্রেরণ করিল। মির্জ্জা মেন্দিকে সিরাজের জননী আমান বেগম প্রতিপালন করিতেন। আমান বেগম আপন মাতা নবাব আলিবর্দ্দির স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে তখন মুর্শিদাবাদে বাস করিতেছিলেন।

"মীরণের প্রেরিত দস্যুগণ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর স্ত্রীর বাসগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মির্জ্জা মেন্দির শিরশ্ছেদন করিল; এবং নবাব আলিবর্দ্দির স্ত্রী এবং আমান বেগমের প্রাণ সংহারার্থ তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আপন প্রাসাদে আনিল।

"আলিবর্দ্দির স্ত্রী আমাকে জননীর ন্যায় বাল্যাবস্থায় প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহার কন্যা আমান বেগমকে আমি সর্ব্বদাই কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতাম। আমার গর্ভজাত নরপিশাচ আমার সেই জননী এবং

---

* The letter from Delhi said, the ministry there disapproved of the accession of Jaffer to the Nababship; that Mirza Mendi, the son of Surajah Dowlah's younger brother, an infant, ought to have been proclaimed * * * * * on the 10th in the morning the whole city was in consternation, and the troops in their different quarters in tumult. A band of ruffians sent by Meerun, had in the night entered the palace of Alliverdy's widow, with whom lived the widow of Zaindee Haimed, and her infant grandson Mirza Mendi They murdered the child, and gave out they had likewise slain the two mothers—*Orme's History of Indoostan Vol. II., page 272.*

কনিষ্ঠা ভগ্নীর প্রাণ সংহারার্থ ধৃত করিয়া আনিয়াছে, এই কথা শুনিয়া আমি অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম। ঘাতকগণ যে গৃহে তাহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত লইয়া গিয়াছিল, পাগলিনীর ন্যায় দৌড়িয়া সেই গৃহাভিমুখে চলিলাম। দুর্ব্বৃত্ত মীরণ তখন নিদ্রা যাইতেছিল। ঘাতকগণকে অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বশীভূত করিয়া, তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিলাম; এবং সেই রাত্রে দুই জনকেই ঢাকা ঘেসিতি বেগমের নিকট প্রেরণ করিলাম। মীরণকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত প্রাতে লোক দ্বারা তিনটী মৃত শব বাহিকা গোরস্থানে প্রেরণ করিলাম। *

"আলিবর্দ্দির স্ত্রীর প্রতি মুর্শিদাবাদের আবালবৃদ্ধ সকলেরই ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। মীরণ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে, এই কথা প্রকাশ হইবামাত্র মুর্শিদাবাদে রাজবিদ্রোহ হইবার উপক্রম হইল। এই বিদ্রোহ নিবারণার্থ মীর কাসিমের দ্বারা আমি বিদ্রোহীদিগের প্রধান লোকের নিকট প্রকৃত অবস্থা বলিয়া পাঠাইলাম। তাহাতে সে দিনের বিদ্রোহ নিবারিত হইল। নতুবা সেই দিনই মীরজাফরের রাজত্ব শেষ হইত।

"এদিকে কাসিমবাজার হইতে একটা † ইংরাজ আসিয়া এই কুকার্য্যের নিমিত্ত মীরণকে তিরস্কার করিতে লাগিল। ইংরাজগণ প্রবঞ্চক এবং অর্থগৃধ্নু হইলেও মীরণের ন্যায় জঘন্য নহে। মীরণ সে ইংরাজটার উপর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল "তোমার কথা শুনিতে চাহি না। ও বুড়া মাগী ডুলী আরোহণে বাড়ী বাড়ী যাইয়া, বিদ্রোহীর দল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি কেন ও মাগীকে জীবত রাখিব?"—

---

* In the morning three biers were carried publicly to burial, amidst the silence grief and abhorrence of the people; for the two women, exclusive of the high condition from which they had fallen by the death of Surajah Dowlah, were the most respectable of their sex, for their viritues and the nobility of their sentiments.—*Orme's History of Indoostan. Vol. II., page 272.*

† On the 13th Mr. Scrafton visited and reproached Meerun, who, amongst other vindications, still preserving a secret said, "Why shall not I kill an old woman, who goes about in her dooley to stir up the Jemautdars against my father ? A few days after it was discovered that the two women had not been murdered, but had been taken out of the palace, and put into boats, which set off immediately for Dacca.—*Orme's History of Indoostan Vol. II., page 272.*

"এই ঘটনার কয়েক মাস পরে মীরণ শুনিতে পাইল, যে, আলিবর্দ্দির স্ত্রী এবং আমান বেগম আমার সাহায্যে ঢাকা পলায়ন করিয়া, আত্মরক্ষা করিয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ ঢাকার নায়েব নবাব জেসারাত্ খাঁকে ইহাদিগের প্রাণ বিনাশার্থ পত্র লিখিল। জেসারাত্খাঁ এইরূপ কুকার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না।* তখন মীরণের প্রেরিত লোক ঘেসিতি বেগম, আমান বেগম, ঘেসিতি বেগমের পালিত পুত্র মুরাদাউদ্দৌলা, সিরাজের দ্বিতীয় পত্নী লোত্‌উন্নিসা বেগম, লোতউন্নিসার গর্ভজাত তিন বৎসর বয়স্ক বালিকা, এবং অপর প্রায় ৭০ সত্তর জন লোককে রাত্রে বুড়ী গঙ্গায় ডুবাইয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করিল। আমার জননী সদৃশী আলিবর্দ্দি খাঁর স্ত্রী পলায়ন করিয়া যে কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহার আর কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না। ইহাদের প্রাণ বিনাশের সংবাদ শ্রবণ মাত্রই আমি শোকে ও দুঃখে উন্মত্তের ন্যায় হইলাম। তৎক্ষণাৎ জামাতা কাসিমালিকে ডাকাইয়া সক্রোধে বলিলাম "বাছা! এখনই মীরজাফর এবং মীরণের প্রাণ বিনাশ করিয়া তুমি বঙ্গের নবাবের পদ গ্রহণ কর।"

"এই দুর্ঘটনা শ্রবণ করিবার পর মাসাধিক পর্য্যন্ত আমি ক্ষিপ্তের ন্যায় কাল যাপন করিতে লাগিলাম। অহর্নিশ কেবল চিন্তা করিতাম যে, এমন কি পাপ করিয়াছিলাম যে, এত দুঃখ কষ্ট আমাকে সহ্য করিতে হইল?

"সময়ে সময়ে আমার মনে হইতে যে ঘেসিতি বেগম এবং তাহার স্বামীই চক্রান্ত করিয়া মীরজাফরের সঙ্গে আমার বিবাহ জুটাইয়া দিয়াছেন। বোধ হয় ঘেসিতি বেগমের সেই পাপে এইরূপ দুরবস্থা হইয়াছে। নবাব আলিবর্দ্দি এবং তাঁহার পণ্ডিত সর্ব্বদাই বলিতেন, যে, মানুষ কুকার্য্য করিয়া

---

* A perwana was sent to Jesarut Cawn, the Nabab of Dacca to put to death all the survivors of the family of Nababs Aliverdi Cawn, Shahamut Jung and Serajah Dowlah ; but upon his declining to obey so cruel an order the messenger who had private instructions to execute this tragedy, in case of the other's refusal, took them from the place of their confinement, carried them out at mid night upon the river, and massacred and drowned them, with about seventy women of inferior note, and attendants. What became of Aliverdi Cawn's widow is uncertain, it being reported by many, that she escaped the fate of the rest of her family. *Original Papers Relative to the Disturbances in Bengal*, page 63-64.

কেবল আপন মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করে। এই কথা স্মরণ হইলে আমার মনে হইত, যে, ঘেসিতি বেগম চক্রান্ত পূর্ব্বক জাফরের সঙ্গে আমাকে বিবাহ দেওয়াইয়া বোধ হয় আপন মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

"আবার কখন কখন আমি ভাবিতাম, যে, বাল্যকালে লোকের মনে যে সকল ভাবের উদয় হয় তাহাই ধর্ম্মানুগত ভাব। বড় হইয়া সংসারে প্রবেশ করিলে হৃদয় মন কঠিন হয়, তখন ন্যায়ানুগত এবং ধর্ম্মানুগত ভাব হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করে না।

"আমি বাল্যকালে যে এই ব্যভিচারক নবাব এবং উমরাদিগকে বিবাহ করিব না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে এত কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। আমি নবাব পত্নী না হইয়া কৃষক পত্নী হইলেও সুখে কালযাপন করিতে সমর্থা হইতাম।

"ঈদৃশ দুঃখ শোক ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কালযাপন করিবার সময় একদিন সন্ধ্যার পর আমার শয়ন গৃহ হইতে অন্দরের প্রাঙ্গনে একটি হিন্দু রমণীর ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। হিন্দু রমণীর বিলাপ ও পরিতাপ শুনিলে বোধ হয় পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। সে অবিশ্রান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে,—"বাবা আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা। তোমাদিগকে স্পর্শ করিলেও আমাদের জাতি যায়। আমাদের সর্ব্বনাশ করিও না। আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিও না।—ও মা গঙ্গে এই কি আমার গঙ্গা স্নানের ফল হইল ?—"

"স্ত্রীলোকটির এইরূপ কাতরোক্তি ও বিলাপ শ্রবণ করিয়া আমি বাহিরে চলিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহারা মীরণের অন্দরের মধ্যে নীত হইল।

"আমি দ্রুত পদে তখন মীরণের অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, যে, তাহার লোকেরা একটী বয়োধিকা স্ত্রীলোক এবং দুইটী যুবতীকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। সেই বয়োধিকা স্ত্রীলোকটী এখন আর করুণস্বরে বিলাপ করে না। সে শরবিদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া আত্মঘাতিনী হইবার চেষ্টা করিতেছে ; বারম্বার সজোরে বক্ষে ও কপালে করাঘাত করিতেছে। যুবতী দুইটী ভয় ও ত্রাসে প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

"মীরণ সেই বয়োধিকা রমণীকে উন্মত্তার ন্যায় কপালে ও বক্ষে করাঘাত করিতে দেখিয়া হি হি করিয়া হাসিতেছে। রমণী যে আপন মনের

দুঃখে আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদ্দৃষ্টে মীরণের ন্যায় নিষ্ঠুর দুর্বৃত্তের মনে দয়ার সঞ্চার হইল না। নিষ্ঠুর বালকগণ পশু পক্ষীকে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া যদ্রূপ তামাসা দেখে, মীরণ সেই রূপ তামাসা দেখিতেছিল।

"আমি ইহাদিগকে দেখিয়াই বুঝিলাম, যে, মীরণের লোকেরা কোন অসদভিপ্রায় সাধনার্থ এই ভদ্রমহিলাদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। আমি তখন সেই বয়োধিকা রমণীর হস্ত ধরিয়া বলিলাম, "মা; তুমি আমার সঙ্গে আইস, এ দুর্বৃত্ত তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেনা।" কিন্তু সে স্ত্রীলোকটী তখন একেবারে উন্মত্তা হইয়া পড়িয়াছে। তাহার হস্ত ধরিবামাত্র সে আমার হাত ছাড়াইতে লাগিল, এবং শত্রু জ্ঞানে আমাকে পদাঘাত করিল। আমি কোন প্রকারেই তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে, মীরণের হস্ত হইতে তাহাকে উদ্ধার করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

"অনেক আত্মপ্রহারের পর রমণী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িল। তখন অতি করুণস্বরে আমি বলিলাম,—"মা তোমার ভয় নাই। আমার এই দুর্বৃত্ত পুত্র তোমাকে এবং এই যুবতীদ্বয়কে এখানে আনিয়াছে। আমি এখনই তোমাদের পতিপুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিব।"—

"আমার কথা শুনিয়া রমণী অধিকতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল, "এমন কুসন্তান তুই গর্ভে ধারণ করিয়াছিস্? তুই বেশ্যা—নহিলে তোর গর্ভে এমন নিষ্ঠুর দুর্বৃত্ত কেন জন্মধারণ করিবে? আমাদের তো সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা। মুসলমান স্পর্শ করিলেই আমাদের জাতিধ্বংস হয়। এখন তুই কোথায় আমাদিগকে পাঠাইয়া দিবি? আমাদিগকে বিষ আনিয়া দে। যমালয় ভিন্ন আর আমাদের কোথাও স্থান নাই। আমার পতিপুত্রের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাঁহারা আর ভদ্র লোকের মধ্যে মুখ দেখাইতে পারিবেন না। হয় তো তাঁহারা এতক্ষণে আত্মহত্যা করিয়াছেন।"—

"রমণীর প্রত্যেক বাক্য আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। আমি আবার বলিলাম,—"মা দুরাত্মা যাহা করিয়াছে, তাহার এখন আর আমি কি করিব। তোমরা তিন জন এই দুরাত্মার গৃহ হইতে আমার সঙ্গে আইস। আমি দেখিব তোমাদের কোন সদুপায় করিতে পারি কি না।"—

"রমণী বলিল, "আমাদের সকল সদুপায় এখন মৃত্যু। এখন আমাদের মরণের সুবিধা করিয়া দে।"——

"এই বলিয়াই রমণী নিকটস্থ যুবতীদিগকে আপন ক্রোড়ের দিকে টানিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা দুই জন এখনও প্রায় অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। আমি প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিবার পর পাপাত্মা মীরণ সে স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল।

"কিছুকাল পরে সে রমণীও বুঝিতে পারিল, যে, মীরণের আক্রমণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং এখন সে-একটু আশ্বস্ত হইল। কিন্তু ক্রোধানলে তখনও তাহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতে-ছিল। সে সক্রোধে বলিতে লাগিল, "বিনামেঘে বজ্রপাত হইয়া এই পাপা-ত্মার মৃত্যু হইবে। হে সর্ব্ব সাক্ষী পরমেশ্বর, যদি আমি সাধ্বী হই, তবে ছয় মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই এ নরাধমের মৃত্যু হইবে।"——

"অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি রমণীকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, এবং অবশেষে তাঁহার হস্ত ধরিয়া, আপন গৃহে লইয়া চলিলাম। আমার আদেশানুসারে দুই জন বাঁদী সেই যুবতীদ্বয়কে ধরিয়া আমার গৃহে লইয়া আসিল। তাহারা তিনজনই একটু সুস্থ হইলে পর আমি বলিলাম,—"মা তোমাদের স্বীয় স্বীয় স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজন কে কোথায় আছেন আমার নিকট বল। আমি এখনই বিশ্বস্ত লোক দ্বারা তোমাদিগকে তাহাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিব। আমার এই কথা শুনিয়া বয়োধিকা রমণী বলিলেন যে তাঁহাদের বাড়ী ঢাকার জিলায়। তাঁহার স্বামী পুত্র এবং জামাতার সঙ্গে তিনি এবং তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূ মুর্শিদাবাদে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছেন। প্রায় পাঁচ দিন হইয়াছে তাঁহারা এখানে আসি-য়াছেন। কিন্তু আজ সায়ংকালে তাঁহার স্বামী ও জামাতা যখন সন্ধ্যা করি-বার নিমিত্ত গঙ্গার ঘাটে গেলেন, তখন তাঁহার ষোড়শ বৎসর বয়স্ক পুত্র এবং তাঁহারা তিন জন গঙ্গার পার্শ্বস্থিত একখানি গৃহে ছিলেন। পূর্ণ একমাস গঙ্গার পারে বাস করিবেন বলিয়া, সেই গৃহ ভাড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু সায়ংকালে তাঁহার স্বামী এবং জামাতার অনুপস্থিতে নবাবের প্যাদা সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। তাহার সঙ্গের যুবতীদ্বয় মধ্যে যাহার প্রায় বিশ বাইশ বৎসর বয়স ছিল, সে তাঁহার কন্যা। আর যে বালিকাটীর মাত্র বার বৎসর বয়ঃক্রম ছিল সে তাঁহার পুত্রবধূ।

"রমণীর মুখে এই কথা শুনিয়া, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বামী এবং

জামাতার অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সমস্ত রাত্র তল্লাস করিয়াও তাহাদিগের সঙ্গে আমার প্রেরিত লোকের সাক্ষাৎ হইল না। রমণীর স্বামীর নাম বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য, জামাতার নাম নীলাম্বর এবং পুত্রের নাম ভুবনেশ্বর ছিল।

"এই স্ত্রীলোক তিনটী সমস্ত রাত্র বসিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমারও সে রাত্রে আর নিদ্রা যাইবার সুযোগ হইল না। প্রাতঃকালে আবার আমি সেই বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্যের অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলাম। কিন্তু আমার প্রেরিত লোক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই আমার এক জন বাঁদীর আত্মীয় স্ত্রীলোক আমাদের অন্দরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এদিক ওদিক তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। এই স্ত্রীলোকটী নবাব বাড়ীর নিকটেই বাস করিত, সদা সর্ব্বদা বাঁদীদিগের সঙ্গে অন্দরের মধ্যেও আসিত। অন্দরের এক এক প্রকোষ্ঠ বাহির হইতে তাকাইয়া দেখিয়া অপরের প্রকোষ্ঠের নিকট যাইতে লাগিল। অবশেষে আমার প্রকোষ্ঠের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে ভয়ে আর বাঙ্‌নিস্পত্তি করিল না, একজন বাঁদীকে ডাকিয়া চুপি চুপি তাহার নিকট কি বলিল। বাঁদী তাহার কথা শুনিয়া, আমার নিকটে আসিয়া বলিল, যে, এই স্ত্রীলোক-দিগের স্বামী এবং আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ সে স্ত্রীলোকটীকে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া আনিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহাদের স্বামী পুত্র কোথায় আছেন?"

"স্ত্রীলোকটী আমার কথার প্রত্যুত্তরে বলিল, "আজ্ঞে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আর এক জন ত্রিশ বৎসর বয়স্ক লোক, আর একটী পনের ষোল বৎসরের ছেলে কাল সমস্ত রাত্রি কেবল নবাব বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা রাত্রে নবাব বাড়ী মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। পাহারাওয়ালাদিগকে কত টাকা কবুল করিল। কিন্তু নবাব বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতে পাহারাওয়ালাগণ সম্মত হইল না। শেষ রাত্রে আমার ঘরের নিকট আসিয়া তাহারা তিন জনই কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের নিকট শুনিলাম, যে, তাহাদের সঙ্গের তিনটী স্ত্রীলোককে নবাব বাড়ী মধ্যে ধরিয়া আনিয়াছে। প্রাতঃকালে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহার সঙ্গের আর দুইটী লোককে বলিল, "বাবা সমস্ত রাত্র যখন নবাব বাড়ী নিয়া রাখিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহাদের জাতিধ্বংস

করিয়াছে। এখন আর আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। চল আমরা তিন জনই গঙ্গায় যাইয়া ডুবিয়া মরি।”

“ “তাহাদিগের দুরবস্থা দেখিয়া আমার বড় দয়া হইল। আমি বলিলাম,— “তোমরা আমার ঘরে বসিয়া থাক, আমি নবাব বাড়ীর মধ্যে যাইয়া এখনই দেখিয়া আসিব তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে নিয়া কোথায় রাখিয়াছে।”—

“ “কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একেবারে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছিল। সে বলিল, “বাছা, আর তাহাদিগকে দেখিলে কি হইবে। তাহাদিগের জাতি মান নষ্ট করিয়াছে।” ইহার পর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার হাতে দশটি টাকা দিয়া বলিল, “বাছা, আমরা এখন প্রাণত্যাগ করিতে চলিলাম। তোমাকে এই দশটি টাকা দিতেছি। তুমি আমাদের একটি উপকার কর। তুমি নবাব বাড়ীর মধ্যে যাইয়া আমাদের সেই স্ত্রীলোক তিনটিকে যদি দেখিতে পাও, তবে তাহাদিগকে বলিবে যে, বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য, পুত্র এবং জামাতা সহ গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তোমাদিগকে তিনি আত্মহত্যা করিতে বলিয়াছেন *। আত্মহত্যা ভিন্ন আর ধর্ম্মরক্ষার উপায় নাই।”—

“ “বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া, সঙ্গী অপর দুইজনকে লইয়া নদীর নিকট চলিল। তাহারা সত্য সত্যই ডুবিয়া মরিবে কিনা, তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি তাহাদিগের পিছু পিছু চলিলাম। কিন্তু তাহাদিগের তিনজনকেই আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িতে দেখিয়াছি।”

“এই স্ত্রীলোকটা এই কথা বলিবামাত্র সেই বয়োধিকা রমণী এবং তাহার কন্যা ও পুত্রবধূ শোক ও দুঃখে একেবারে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। আমি তখন চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিলাম না যে, কি কথা বলিয়া ইহাদিগকে সান্ত্বনা করিব। সেই দ্বাদশবৎসরবয়স্কা বালিকাটী

---

* সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ যে কখনও কখনও আপন আপন স্ত্রী কন্যার সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত নবাবের কিম্বা ইংরাজের লোক গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে স্বহস্তে আপন আপন স্ত্রী কন্যার প্রাণ বিনাশ করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সিরাজের কলিকাতা আক্রমণের পূর্ব্বে ইংরাজেরা উমিচাঁদকে সন্দেহ করিয়া তাহাকে কয়েদ করিল। উমিচাঁদের বাড়ী লুট করিতে সৈন্য পাঠাইল। উমিচাঁদের লোক তখন স্ত্রীলোকদিগের জাতি মান রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে স্বহস্তে তের জন স্ত্রীলোকের শিরশ্ছেদন করিয়াছিল। Orme's History of Indostan Vol. II. page 60.

কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিল। কিন্তু বাণেশ্বরের স্ত্রী এবং কন্যা আত্ম-ঘাতিনী হইবার উদ্দেশ্যে কেবল আত্মপ্রহার করিতে লাগিলেন।

"প্রায় তিন ঘণ্টা পরে সেই স্বর্ণ প্রতিমা সদৃশী বার বৎসর বয়স্কা বালিকাটীর মুখের দিকে চাহিয়া বাণেশ্বরের স্ত্রী বলিলেন, "আমি নিজে আত্ম হত্যা করিতে পারি। কিন্তু এ বালিকাকে আমি কিরূপে আত্মহত্যা করিতে বলিব?"—

"এই বলিয়া, তিনি পুত্রবধূকে ক্রোড়ে করিয়া, আবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই রমণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস দর্শনে আমি আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে আপন কন্যার নিকট বলিতে লাগিলেন,—

" "বাছা, সকল শাস্ত্রই কি মিথ্যা হইল! আমার শ্বশুর জ্যোতিষশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, বিংশতি বৎসর আমি পরম পবিত্র কাশীধামে বাস করিয়া পরে ষাট্‌বৎসর বয়সের সময় স্বামীসহ সহ মৃতা হইব। আমাকে কখনও বিধবা হইতে হইবে না। আমার পুত্র বিশ্ববিজয়ী হইবেন। আমার পুত্রবধূ বীরমাতা হইবেন। কেবল এক তোমার বিষয়ই বলিয়াছিলেন, যে বাইশ বৎসর বয়সে তুমি বিধবা হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক জগত পবিত্র করিবে। আমার শ্বশুরের কি সকল কথাই মিথ্যা হইবে? কখনও না—কখনও না। তিনি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার একটি কথাও কখনও নিষ্ফল হয় নাই। যাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই কালে সফল হইয়াছে। হয়তো এই তীর্থ স্থানে আসিয়া আমরা কোন মহাপাপ করিয়াছি; তজ্জন্যই এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আমার পতি পুত্র জামাতা হয়তো আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিবেন। আর শাস্ত্রে কথিত আছে, ভগবতী গঙ্গা নারীচরিত্রের একমাত্র আদর্শ। তিনি নারী হইয়া—মা হইয়া, কি কখন স্বীয় বক্ষের উপর ব্রহ্ম হত্যা হইতে দিবেন? গঙ্গা কখনও আমার স্বামী পুত্রকে আত্মহত্যা করিতে দিবেন না। আমরা এই অপবিত্র নবাব অন্দর হইতে বাহির হইয়া, চল কাশীতে চলিয়া যাই। যদি আমার স্বামী পুত্র জামাতা আত্মহত্যা করিয়া থাকেন, তবে গয়ায় পিণ্ড না পড়িলে তাঁহাদেরও মুক্তি হইবে না। অন্ততঃ তাঁহাদের পিণ্ড প্রদান না করিয়া, আমরা আত্মহত্যা করিব না। দ্বাদশ বৎসর পরে তাঁহাদের পিণ্ডদান

করিয়া, পরে আমরা তিন জনেই আপন আপন স্বামীর কুশপুত্তল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তৎসঙ্গে চিতারোহণ করিব। এখন আমি কোন্ প্রাণে এই দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা পুত্রবধূকে আত্মহত্যা করিতে বলিব? আর আমরা দুইজনে আত্মহত্যা করিলে, ইহাকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইব?"

"জননীর এই কথা শুনিয়া, বুদ্ধিমতী কন্যাও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। তখন রমণী তাঁহাকে নবাবের অপবিত্র গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার সুবিধা করিয়া দিতে বলিলেন।

"ইহারা যে আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিল, তাহাতে আমি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ বিশ্বস্ত খোজা এবং দুই জন বাঁদী ইহাঁদিগের সঙ্গে দিয়া কাশীর রাস্তার উপর ইহাঁদিগকে উঠাইয়া দিয়া আসিতে বলিলাম। ইহাঁদিগের পথের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিবার সময় ব্রাহ্মণী কোন ক্রমেই অর্থ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। আমি বলিলাম, "মা, এখন তোমাদের সঙ্গে একটি পয়সাও নাই, কি প্রকারে কাশীতে চলিয়া যাইবে?" অনেক বলিয়া কহিয়া, আমি ব্রাহ্মণীর পুত্রবধূর অঞ্চলে পঞ্চাশটী মহর এবং কয়েকটী টাকা বান্ধিয়া দিলাম। তাঁহারা তিন জনই কাশীতে চলিয়া গেলেন। এই ব্রাহ্মণীর নাম জগদম্বাদেবী ছিল।

"কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জগদম্বাদেবীর বাক্য নিষ্ফল হইল না। এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরে, বিনা মেঘে বজ্রপাত হইয়া, আমার কুপুত্র নবাব নসিরাল্ মুলকের প্রাণ বিনষ্ট হইল।

"নসিরাল্ মুলকের মৃত্যু সংবাদে আমি এক বিন্দু অশ্রুও বিসর্জ্জন করি নাই। তাহার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিবামাত্র উজু করিয়া নেমাজ গৃহে প্রবেশ করিলাম, এবং খোদাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "আয়ে খোদা তেরি সব মরজি হো চুকে—মেরি কিস্মত্ মে যো লিখা হায়ে এলাহি! সিতাব হো।"

"নসিরাল্ মুলকের মৃত্যু ঘটনা জগদম্বাদেবীর প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা অত্যন্ত বৃদ্ধি করিল। মনে করিতে লাগিলাম যে এই কুপুত্র হইতে তিনিই আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং সেই হইতে আমি সেই পরমসাধ্বী রমণীর নাম ধারণ করিতেছি। সেই হইতেই আমার নাম জগদম্বা বেগম।

জগদম্বা শব্দের অর্থ সকলের মা। আমার ইচ্ছা যে আমি সকলকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি।"

জগদম্বাবেগম এইরূপে আত্ম বিবরণ বিবৃত করিলে পর বউ বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন,"আপনার স্বামীকে নাকি সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত আপনি জামাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন?"

জগদম্বা বেগম আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার এই কন্যার প্রতিই আমার অধিক স্নেহ। পুত্র আমার চক্ষের শূল ছিল। নসিরাল মুলকের মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমি মীরকাসিমকে সিংহাসন অধিকার করিতে পরামর্শ দিয়া ছিলাম। মীরকাসিম আলিবর্দ্দি খাঁর একজন আত্মীয় ছিলেন। কাসিনালি প্রথম হইতে আলিবর্দ্দির স্ত্রীর সঙ্গে একত্র হইয়া চেষ্টা করিলে, ইংরাজদিগের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও, সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার কি দুর্বুদ্ধি হইল, তিনি ইংরাজদিগের সাহায্যে রাজ্য লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হলওয়েল সাহেব নামক একজন ইংরাজকে কেবলই উৎকোচ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে হল্ওয়েল সাহেবের দ্বারা তাঁহার বড় উপকার হইল না। লোক পরম্পরায় শুনিতে পাই যে, কোন কোন ইংরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই কাসিমালি নসিরাল্ মুলকের প্রাণবধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাসিমালি নিজে একথা বরাবর অস্বীকার করিয়াছেন। কাসিমালি ইংরাজদিগের সাহায্যে রাজ্য লাভ করিয়াই সর্ব্বনাশ করিলেন। সস্নেহে প্রজাপালন করিবার তাঁহার বিলক্ষণ ইচ্ছা ছিল। ইংরাজদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি প্রাণপণে যত্ন করিতেন। কিন্তু ইংরাজদিগকে তিনি যে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সেই টাকা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রজার উপর ঘোর অত্যাচার করিতে হইল। তাঁহার আমলে জমিদার তালুকদারদিগের উপরও অত্যন্ত অত্যাচার হইতে লাগিল। যে রাজা প্রজার উপর অত্যাচার করে তাঁহার রাজ্য কখনও চিরস্থায়ি হয় না। সুতরাং কাসিমালি রাজ্যচ্যুত হইয়া আপনাদিগের আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়া আমরা বেরিলিতে অবস্থান করিতে ছিলাম। পরে আপনাদের অনুরোধে এখানে আসিয়া তদবধি আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতেছি।"

জগদম্বা বেগম সায়দউন্নিসা এবং বউ বেগমের নিকট এইরূপে আত্ম-বিবরণ বিবৃত করিলে পর, তাঁহাদের মন একটু বিগলিত হইল। তাঁহারা উভয়ই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সুজার হস্ত হইতে হাফেজনন্দিনীকে কি প্রকারে রক্ষা করা যাইতে পারে?

জগদম্বা বলিলেন, "সুজা এখানে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হাফেজ-নন্দিনীকে স্থানান্তরে প্রেরণ করুন। হাফেজনন্দিনী রোহিলাধিপতির কন্যা। আপনারাও একবার বিপদে পড়িয়া, রোহিলাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাফেজনন্দিনীর প্রতি অত্যাচার করিলে নিশ্চয়ই, সুজার কোন বিশেষ অমঙ্গল হইবে।"

সায়দউন্নিসা বউবেগমকে বলিলেন, "তুমি ইহাকে স্থানান্তরে প্রেরণের ভার গ্রহণ কর।"

বউবেগম মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে, পুত্রের নিকট ইনি নির্দ্দোষী থাকিতে চাহেন; এ বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়ীত্ব আমাকে গ্রহণ করিতে বলেন; এ বড় স্বার্থপরতার কার্য্য।

হাফেজনন্দিনীকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবেন, এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। জগদম্বা বলিলেন, "আপনারা উভয়েই এই দায়িত্ব গ্রহণ করুন।"

সায়দউন্নিসা এবং বউবেগম অবশেষে ইহাতে উভয়েই সম্মত হইলেন। কিন্তু কোথায় তাঁহাকে পাঠাইবেন সেই বিষয়ে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইবা-মাত্র, কেল্লা হইতে দুরূম্ দুরূম্ শব্দে তোপ পড়িতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে রণবাদ্যের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঢ্যাঙ্গঢ্যাঙ্গ ফো ফো ফো এই শব্দে রাজপ্রাসাদ পরিপূর্ণ হইল। "নবাব আসিয়াছেন" "নবাব আসিয়াছেন" লোকারণ্যের এই চীৎকারে পরস্পরের কথা শুনিবার কাহারও সাধ্য নাই। বেগমেরা আপন আপন আসন হইতে উঠিয়া যাইয়া, গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইলেন। লোকারণ্যের কোলাহলে পড়িয়া সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন। এ সংসারের ধুমধাম এবং লোকারণ্যের কোলাহলের মধ্যে পড়িয়া মানুষ সর্ব্বদাই আপন আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়।

কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে দেখা গেল, যে, নবাব এখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই। তিনি এখনও লক্ষ্ণৌ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে আছেন। ইংরাজ

সৈন্যের অগ্রভাগ দেখিয়াই, লোকে নবাব আসিয়াছেন বলিয়া, চীৎকার করিয়াছিল।

লোকারণ্যের কোলাহল একটু থামিল। সংসারে শত সহস্র কোলাহলের মধ্যে থাকিলেও জগদম্বা কখনও স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়েন না। তিনি আবার বেগমদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "কোথায় হাফেজনন্দিনীকে পাঠাইবে তাহা এখনই অবধারণ কর। আর সময় নাই।"

বেগমদ্বয় আবার জগদম্বার সঙ্গে একত্র হইয়া বসিলেন। বেগমেরা বলিলেন "এমন স্থানে তাহাকে রাখিতে হইবে যে সুজা অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলে তাঁহাকে আবার তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিতে পারি।"

জগদম্বা বলিলেন, "তবে সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্য প্রতিপালনের ইচ্ছা তোমাদের নাই। বড় আঁটা আঁটি দেখিলে, তাঁহাকে সুজার হাতে সমর্পণ করিবে।"

এইরূপ বাদানুবাদে অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইবামাত্র আবার দুরুম্ দুরুম্ শব্দে তোপ পড়িতে লাগিল। আবার সেই ঢ্যাঙ্গ ঢ্যাঙ্গ ফো ফো আরম্ভ হইল। আবার "নবাব আসিয়াছেন" "নবাব আসিয়াছেন" বলিয়া চীৎকার হইতে লাগিল। বেগমেরা জানালার নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। একঘণ্টা পর্য্যন্ত লোকারণ্যের কোলাহল চলিতে লাগিল। একঘণ্টা পরে শুনা গেল, ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনেরেল চাম্পীয়ন আসিয়া পৌছিয়াছেন।

এই দ্বিতীয় বারের কোলাহল একটু থামিলে পর আবার জগদম্বাবেগম অযোধ্যার বেগমদ্বয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "আর সময় নাই, এখন ঠিক কর কোথায় হাফেজনন্দিনীকে পাঠাইতে হইবে।"

কিন্তু এখন আর সত্য সত্যই সময় নাই। বেগমদ্বয় আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই নবাব সৈন্যের অগ্রভাগ লক্ষ্ণৌ আসিয়া পৌছিল। দুইবার সমুদয় লোক "নবাব আসিয়াছেন, নবাব আসিয়াছেন" বলিয়া চীৎকার করিয়া নিরাশ হইয়াছে। এবার সত্য সত্যই নবাব আসিয়া পৌছিয়াছেন। দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত রণ বাদ্য আরম্ভ হইল। দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত লোক চীৎকার করিতে লাগিল। ঘোর কোলাহল উপস্থিত হইল। এসংসারে লোক সময় থাকিতে কাজ না করিলে, কখন কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে না। সময় কাহারও নিমিত্ত অপেক্ষা করে না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পিতৃবৈরী বিনাশ।

বেলা প্রহরেক থাকিতে, নবাব সুজাউদ্দৌলা রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। বাহির বাড়ীর দরবার গৃহ বিশেষ রূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক নবাব সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। দেওয়ান, বক্‌সী, উজীর এবং অন্যান্য আমলা সকলেই করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া আছেন। গৃহের বাহিরে গায়িকা নর্ত্তকী বাদ্যকর প্রভৃতি আপন আপন পারদর্শিতার পরিচয় প্রদানার্থ তুমুল সংগ্রাম করিতেছে। প্রত্যেকেই অন্যান্য সকলকে পশ্চাতে রাখিয়া নবাবের দৃষ্টিপথে আসিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

নবাব প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদিগের সহিত কিঞ্চিৎ আলাপ করিয়া, উজীর পাত্র মিত্র সহ নেমাজ পড়িবার নিমিত্ত মস্‌জিদে চলিলেন। আজ ছোট বড় সকল লোকেরই একটু নেমাজ পড়িবার ইচ্ছা হইল। হিন্দু আমলা এবং কর্ম্মচারিগণ এখন আর নবাবকে অনুসরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা গায়িকা এবং নর্ত্তকীদিগের মনোরঞ্জনার্থ গান বাদ্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এদিকে অত্যুৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সুসজ্জিত, আতর মাখা রুমাল হাতে, মুসলমানের দল বক্ষস্ফীত করিয়া, একবার খোদার কাছে হাজিরা লেখাইতে চলিলেন। এই সকল মুসলমান কুলতিলক হাসিতে হাসিতে যেরূপ দ্রুত পদে চলিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যেন খোদা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত রেজিষ্টরী হাতে করিয়া মস্‌জিদে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। ইহারা মস্‌জিদে গেলেই তিনি হাজিরা লিখিতে আরম্ভ করিবেন।

নবাব রোহিলা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন; নিরাশ্রয়া রোহিলা রমণী দিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছেন; এ শুভ সংবাদটা খোদার কাছে অবশ্যই বলিতে হইবে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে নবাবের নেমাজ সমাপ্ত হইল। মস্‌জিদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার দরবার গৃহে কিছুকাল বসিলেন। এবার তাঁহার দরবার গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই ভৃত্যেরা ঝাড় লণ্ঠন ইত্যাদি দ্বারা গৃহ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। নবাব এই সকল আয়োজন দর্শনে যার

পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং চারিদণ্ড রাত্রের সময় বেগমদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বড় অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে অন্দরের মধ্যে বেগমগণ নবাবের বাহির বাড়ী পোঁছিবার অব্যবহিত পরেই নেমাজ গৃহে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। বড় অন্দরবাসিনী বেগমদিগের মধ্যে কখন কোরাণ পাঠ করিবার প্রয়োজন হইলে, মীরকাসিমের স্ত্রীকেই সকলে পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন। বউ বেগম মীরকাসিমের স্ত্রীর অনুসন্ধানার্থ অকস্মাৎ হাফেজনন্দিনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। বিষাদে হাফেজনন্দিনীর মুখকমল ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই বিষাদ পরিপূর্ণ মুখেরদিকে চাহিলেও, সে মুখ কমলের অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে সকলের মনই মোহিত হইত। বউ বেগম ইহার সেই অপরূপ রূপ লাবণ্য দেখিয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে, নবাব ইহাকে নিকা করিলে ইনি নিশ্চয়ই প্রধান বেগম হইবেন।

এই চিন্তা তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট প্রদান করিতে লাগিল। তিনি স্থিরনেত্রে হাফেজনন্দিনীর মুখের দিকে একবার চাহিতেও পারিলেন না। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না। মনের ভাব গোপন পূর্ব্বক মীর কাসিমের পত্নীকে সঙ্গে করিয়া নেমাজ গৃহে চলিলেন। ইহারা দুই জন প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইবার সময়, প্রকোষ্ঠ দ্বারে জগদম্বার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বউ বেগম জগদম্বাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি নেমাজ গৃহে যাইবেন না?"

জগদম্বা বলিলেন, "খোদার সমুদয় কার্য্য অগ্রে সম্পন্ন না করিয়া, তাঁহার নিকট গেলে, তিনি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন।"

বউ বেগম এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; এবং জগদম্বাকে বলিলেন, "খোদার কি কি কার্য্য করিতে বাকী রহিয়াছে?"

জগদম্বা বলিলেন, "হাফেজনন্দিনীকে সুজার হস্ত হইতে রক্ষা করাইতো এক কার্য্য দেখিতে পাই।"

বউ বেগম এই কথা শুনিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

জগদম্বা আবার বলিলেন, "নবাব আলিবর্দ্দির মুখে শুনিয়াছি, যে, সংসারে দুই প্রকার নবী আছেন; আম নবী এবং খাস নবী। তিনি বলিতেন মহম্মদ আমাদের সকলেরই আম নবী। মহম্মদ পৃথিবীর সমুদয়

লোককে ধর্ম্মোপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এ সংসারে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের খাস নবী। একজন যখন অপরের ভ্রম দেখাইয়া দিতেছেন, এক জন যখন অন্যের কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিতেছেন, তখন তিনি খাস নবীর কার্য্য করেন। এ সংসারে আম নবীর বাক্য প্রতিপালন করিবার পূর্ব্বে খাস নবীর কথা পালন করিতে হইবে। আজ আমি তোমার খাস নবী। এখনও সময় থাকিতে হাফেজনন্দিনীর একটা সদুপায় কর। আমার এই অনুরোধটী রক্ষা কর। এই কর্ত্তব্য সম্পন্ন না করিয়া খোদার কাছে গেলে, তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না।"

বহু বেগম মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে এখন আর তাহার সময় নাই। তিনি জগদম্বার কথার প্রত্যুত্তরে কিছু না বলিয়া, মীরকাসিমের স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া অন্দরের মধ্যস্থিত নেমাজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সেখানে সায়দউন্নিসা বেগম তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

নেমাজ করিতে বসিবার পূর্ব্বে মীর কাসিমের স্ত্রী কোরাণ হইতে পাঠ করিলেন—

"ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিলে, সংসারে কেহই তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কিন্তু ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলে, তুমি অবলম্বন রহিত, মূল শূন্য শুষ্ক তৃণের ন্যায় সংসারের বায়ু দ্বারা কেবল এদিক ওদিক পরিচালিত হইবে। অতএব তুমি সর্ব্বদা কেবল ঈশ্বরের উপরই নির্ভর কর।"

কোরাণ পাঠের পর ইহারা একত্র হইয়া নেমাজ করিতে লাগিলেন। নেমাজ সমাপ্ত করিয়া বাহিরে আসিবার অব্যবহিত পরেই নবাব সুজাউদ্দৌলা অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবাব কিছুকাল স্বীয় জননীর সহিত বাক্যালাপ করিয়া, বহু বেগমের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। বহু বেগম পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া বসিয়াছেন, যে, রোহিলখণ্ড নবাবের রাজ্যভুক্ত হইলে রোহিলাদিগের দুই এক খানি জায়গীর স্বামীর নিকট হইতে চাহিয়া লইবেন। কিন্তু প্রায় এক মাস কি দেড় মাসের পর আজ তাঁহার স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন; আজই স্বীয় প্রার্থনা প্রকাশ করা উচিত, কি না, তাহাই ভাবিতেছিলেন।

হাফেজনন্দিনীর প্রতি সুজা কোন অত্যাচার না করেন, সেই বিষয়

অনুরোধ করিতে জগদম্বা বহু বেগমকে পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছিলেন। বহু বেগমও সুজার নিকট এই অনুরোধ করিবেন বলিয়া, জগদম্বার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ইহাদিগের নেমাজের পর জগদম্বা যখন দেখিলেন যে, হাফেজনন্দিনীকে আর স্থানান্তরিত করা হইল না, তখনই বহু বেগমের নিকট এই শেষ অনুরোধটী করিলেন। কিন্তু বহু বেগম স্বামীর নিকট জায়গীরের বিষয় আজই বলিবেন কি না সেই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অন্য সকল কথাই বিস্মৃত হইলেন। হাফেজনন্দিনীর বিষয়ে সুজার নিকট কোন কথা বলিতে আর তাঁহার স্মরণ হইল না। অর্থ চিন্তা অর্থ প্রলোভন নিবন্ধন মানুষ সর্ব্বদাই আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়।

সুজা রোহিলখণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালেই মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছেন, যে, লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়াই হাফেজনন্দিনীকে নিকা করিবেন। হাফেজনন্দিনীর সেই অপরূপ রূপ লাবণ্য তাহাকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। পথে পথে পুনঃ পুনঃ কেবল হাফেজনন্দিনীর মুখ কমল তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হইত।

এখন বেগমের সহিত দুই চারি কথা বলিয়াই শয়ন প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া, বাঁদীদিগকে হাফেজনন্দিনীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন।

বাঁদীগণ সহাস্য মুখে হাফেজনন্দিনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক নবাবের আদেশ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল। তিনি বাঁদীদিগের কথায় কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

বাঁদীগণ আবার তাঁহাকে নবাবের আদেশ জ্ঞাপন করিল। তিনি এবারও কোন উত্তর প্রদান করিলেন না।

বাঁদীগণ নবাবের নিকট যাইয়া বলিল, "হাফেজের কন্যা আপনার হুকুম শুনেন না।"

নবাব সহাস্য মুখে বলিলেন, "তাহাকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া আন।"

বাঁদীগণ আবার হাফেজনন্দিনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক নবাবের এই দ্বিতীয় আদেশ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল।

হঠাৎ হাফেজবালার কোরাণের সেই কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন, "মানুষকে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হইতে হইবে।" হঠাৎ যেন তাঁহার অন্তরে পিতৃবৈর নির্য্যাতনের আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইল। তিনি বাঁদীদিগের সঙ্গে সুজার শয়ন প্রকোষ্ঠে

প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সুজা বাঁদীদিগকে স্থানান্তরে যাইতে বলিলেন।

বাঁদীগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেলে পর, সুজা হাফেজনন্দিনীকে স্বীয় শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুজা আবার বলিলেন, "তোমার ভয় নাই। আমি তোমাকে প্রধান বেগম করিব।"

হাফেজনন্দিনী প্রত্যুত্তর করিলেন না।

সুজা স্বয়ং শয্যা হইতে উঠিয়া, হাফেজবালাকে ধরিবার অভিপ্রায়ে এক পদ অগ্রসর হইবামাত্র হাফেজনন্দিনী সক্রোধে বলিলেন—"দুর্ব্বৃত্ত, আমাকে স্পর্শ করিলে এখনই তোর মৃত্যু হইবে।"

সুজা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমার ভয় নাই। তুমি অযোধ্যার বেগম হইবে।"

হাফেজনন্দিনী। তোর অযোধ্যা আমি পদতলে দলন করি। যদি প্রাণের আশা থাকে কখনও আমাকে স্পর্শ করিস্ না।

সুজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তুমি আমার প্রাণ বিনাশ করিবে?

হাফেজনন্দিনী। তুই হারাম, তোর মুখ দর্শন করিলেও পাপ হয়।

সুজা। বাঁদী তুমি অযোধ্যার নবাবকে হারাম বলিতেছ? এত আস্পর্দ্ধা!

হাফেজনন্দিনী। তুই নবাব নহিস্। তুই নিশ্চয়ই হারাম।

"কি আবার! এত আস্পর্দ্ধা!" এই বলিয়া সুজা অগ্রসর হইয়া হাফেজ-নন্দিনীকে ধরিবার উপক্রম করিবামাত্র তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তৎক্ষণাৎ কেশের মধ্যস্থিত সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া, সুজার বক্ষে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে আঘাত সুজার স্কন্ধের নীচে বাহুর উপর পড়িল। বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় বিষাক্ত ছুরিকার অগ্রভাগ সুজার শরীরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি চীৎকার করিয়া, ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। এদিকে হাফেজবালা সেই ছুরিকা তৎক্ষণাৎ স্বীয় বক্ষে সংবিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

সুজার চীৎকারের শব্দ শুনিয়া নিকটস্থিত প্রকোষ্ঠ হইতে বাঁদীগণ তৎক্ষণাৎ নবাবের শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। কিন্তু কি ভীষণ দৃশ্য!

হাফেজবালার বক্ষে ছুরিকার অগ্রভাগ এখনও প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। হাত খানি বক্ষের উপর রহিয়াছে। তিনি ধরাশায়িনী হইয়া পড়িয়াছেন। এদিকে নবাব সুজাউদ্দৌলা ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীর বিষের যন্ত্রণায় ছট ফট করিতেছে।

বাঁদীগণ মধ্যে কেহ কেহ তখন তালবৃন্ত হাতে করিয়া সুজাকে বাতাস করিতে লাগিল। আর দুই তিন জন দৌড়িয়া যাইয়া বহু বেগম এবং সায়দউন্নিসা বেগমকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিল। চারি পাঁচ মিনিটের মধ্যে অন্দর মহল কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল।

বেগমেরা নবাবের শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই দেখেন যে, সুজা যন্ত্রনায় ছট ফট করিতেছে, তাহার বাহু হইতে অত্যল্প শোণিত নির্গত হইয়াছে। এদিকে স্বর্ণপ্রতিমা হাফেজবালা ছুরিকা বক্ষে পড়িয়া রহিয়াছেন।

বেগমেরা প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে সুজার কোন অনিষ্ট হয় নাই; কেবল হাফেজবালাই আত্মহত্যা করিয়াছেন। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সুজাকে ছট্ ফট্ করিতে দেখিয়া তাঁহাদের বিশেষ আশঙ্কা হইল। তাঁহারা মার্ত্তুজাখাঁ, হায়েদরবেগ্ খাঁ, আমিরবেগখাঁ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্ম-চারিদিগের নিকট বিশ্বস্ত খোজা দ্বারা গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন। তাহারা সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তৎক্ষণাৎ অন্দরের মধ্যে আসিয়া সকল বিষয় গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

স্বয়ং মার্ত্তুজা খাঁ হেকিম আমজেদ্আলি খাঁর ভবনে যাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। আমেজেদ্আলি খাঁর জন্মস্থান পারস্য দেশের অন্তর্গত ইস্পাহান। ইনি ইস্পাহান হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া পূর্ব্বে দিল্লীতে ছিলেন। সবদর জঙ্গের সময় হইতে অযোধ্যার উজীরের হেকিমের পদে নিযুক্ত হইয়া, তদবধি লক্ষ্ণৌ নগরে অবস্থান করিতেছেন।

হেকিম আমজেদ্ আলি মার্ত্তুজ খাঁর সঙ্গে নবাবের শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাঁহার জখম পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। নবাবের বাহুর উপর অত্যন্ত ক্ষুদ্র আঘাত লাগিয়াছিল। অর্দ্ধ ইঞ্চির অধিক ছুরিকা প্রবিষ্ট হয় নাই। কিন্তু এমন ক্ষুদ্র আঘাতে নবাব যে কেন এত ছট্ ফট্ করিতে-ছেন, তাহা প্রথমতঃ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরে হাফেজবালার বক্ষ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া দেখিলেন যে ছুরির অগ্রভাগে বিষ ছিল। সেই বিষ পরীক্ষা করিয়া আমজেদ আলি বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই

বিষ শরীরের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে আর প্রাণ রক্ষা হয় না। এ বিষ শরীরের রক্ত সংস্পর্শ করিবামাত্র নবাবের মৃত্যু হইত। কিন্তু অতাল্প পবিমাণ বিষ শরীরের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। সুতরাং এখনও নবাবের মৃত্যু হয় নাই। নবাবকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। নবাবের সমুদয় শরীর প্রথমে স্ফীত হইয়া শরীরের মাংস পচিতে থাকিবে। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ থাকিবে না। ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ পচিয়া উঠিলেই নবাবের মৃত্যু হইবে। এখন আর নবাবের প্রাণরক্ষার কোন উপায় নাই।"

বেগমেরা হেকিমের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। নবাবের ছটফটি নিবারণার্থ কেহ তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন, কেহ মস্তকে গোলাপ জল ঢালিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই শারীরিক যন্ত্রণা নিবারিত হইল না।

এদিকে মার্ত্তুজ খাঁ প্রভৃতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণ অন্দরের বাঁদী এবং খোজাদিগকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া বলিল, যে, এই সকল ঘটনা কেহ প্রকাশ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। সকল বিষয় গোপন রাখিতে হইবে।

হাফেজনন্দিনীর ক্ষুদ্র শরীর খানি এখনও ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই হাসিভরা সরলতা পরিপূর্ণ মুখ খানি হইতে এখনও যেন মৃদু হাস্য বাহির হইতেছে। মার্ত্তুজা খাঁ প্রভৃতি উপস্থিত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণ কয়েক জন বিশ্বাসী গোলামকে ডাকাইয়া আনাইয়া, রাত্রি অবসান হইবার পূর্ব্বেই খোর্দ্দ মহালের পশ্চাৎস্থিত উদ্যানে সেই স্বর্ণ প্রতিমা ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখিতে বলিলেন। গোলামগণ হাফেজনন্দিনীর মৃত শরীর স্কন্ধে করিয়া, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে কবর দিতে চলিল।

হেকিম আমজেদ আলি খাঁ যখন নবাবের শয়ন প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন মার্ত্তুজা খাঁ প্রভৃতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণ অন্দরের সমুদয় বাঁদীদিগকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। বাঁদীগণ মধ্যে অনেকেই পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া হেকিমের সমুদয় কথা শুনিয়াছিল।

বাঁদীদিগের মধ্যে পাঠকগণের পূর্ব্ব পরিচিত প্রেমিকা তোফানী আজ অমর সিংহকে স্ত্রীলোকের বেশে অন্দরের মধ্যে আনিবে বলিয়া, প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু এই উপস্থিত সংঘাতিক ঘটনা নিবন্ধন এখন পর্য্যন্তও সে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া, অমর সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারে

নাই। অমর সিংহ সেই পুষ্করিণীর পারে আসিয়া তোফানীর অপেক্ষা করিতেছে। হেকিম আমজেদ্ আলি খাঁ আসিলে পর মার্ত্তুজ খাঁ প্রভৃতি যখন বাঁদীদিগকে প্রকোষ্ঠের বাহিরে যাইতে বলিল, তখন তোফানী অমর সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিল। সে প্রথমতঃ গোপনে পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া হেকিমের সমুদয় কথা শুনিল। কিন্তু ইহার পর মার্ত্তুজা খাঁ বাঁদী ও খোজাদিগকে ডাকিয়া এই সকল কথা গোপন রাখিবার নিমিত্ত সাবধান করিয়া দিয়া, সকলকে আপন আপন শয়ন প্রকোষ্ঠে যাইতে বলিলেন। কেবল তিন জন খোজা এবং চারি পাঁচ জন বিশ্বস্ত বাঁদী যাহারা কখন অন্দরের বাহির হয় না, তাহাদিগকেই নবাবের সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন।

তোফানী এখন বিদায় পাইয়া, তৎক্ষণাৎ অমর সিংহের অনুসন্ধানে পুষ্করিণীর পারে চলিয়া গেল। অমর সিংহ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে তোফানীর অপেক্ষা করিতেছে।

তোফানী পুষ্করিণীর পারে উপস্থিত হইবামাত্রই অমর সিংহ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল—

"আমি তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। এখন আর বিলম্ব না করিয়া, আমাকে শীঘ্র শীঘ্র অন্দরের মধ্যে লইয়া যাও।"

তোফানী বলিল—"আজ্ বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোন প্রকারেই তোমাকে অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারি না।"

অমর সিংহ গোলযোগের কথা শুনিয়া আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গোলযোগ হইয়াছে ?"

তোফানী বলিল, "সে কথা প্রকাশ করিলে মার্ত্তুজা খাঁ প্রভৃতি আমাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিবে। কিন্তু তুমি আমাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভাল বাস, আমিও তোমাকে আপন জানের মতন দেখি। তোমার নিকট বলিতে কোন দোষ নাই। কিন্তু সাবধান এ সকল কথা কোন প্রকারে প্রকাশ না হয়।"

অমরসিংহ অপেক্ষাকৃত অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "কি গোল যোগ হইয়াছে বল। আমি কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না।"

তখন তোফানী বলিতে লাগিল, "আজ রাত্রে নবাব খাস কামরায় যাইয়া সেই হাফেজ রহমত খাঁর মেয়েকে ডাকাইয়া নিয়াছিলেন। হত

ভাগিনীর কিস্‌মতে সুখ নাই। সে নবাবের নজরে পড়িয়াছিল। নবাব তাহাকে নিশ্চয়ই নিকা করিতেন। কিন্তু সে আপন সঙ্গে সঙ্গে একখানা বিষ মাখা ছুরী লুকাইয়া রাখিয়াছিল। নবাব আদর করিয়া তাহাকে ধরিতে আসিবামাত্র সে সেই ছুরী দ্বারা নবাবের বাহুর উপর জখম করিয়া পরে নিজের বুকে ছুরী দিয়া মরিয়াছে। অন্দরের মধ্যে এখনও মার্তুজ খাঁ, হায়দরবেগ্ খাঁ ও আমিরবেগ্ খাঁ বসিয়া আছেন। হেকিম আমজেদ্ আলি খাঁ নবাবের জখম দেখিয়া বলিয়াছেন, যে নবাব নিশ্চয়ই মরিবেন। নবাব পাঁচ ছয় মাসের অধিক বাঁচিবেন না। নবাবের সমুদয় শরীরের মাংস পচিয়া উঠিবে। ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকিবে না। নবাব এখনও সেই বিষের যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছেন।"

অমরসিংহ এই কথা শুনিয়া, একেবারে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মুখে আর বাক্য নাই।

কিন্তু তোফানী বলিল, "তুমি এতো দুঃখিত হইলে কেন? এ নবাব মরিয়া গেলে, আসফউদ্দৌলা নবাব হইবেন। আসফউদ্দৌলা জন্মিলে পর আমি তাহার নাড় কাটিয়াছি। সে অবশ্য আমাকে পেয়ার করিবে।"

কিছুকাল পরে অমরসিংহ আপন হৃদয়ের সমুদয় ভাব গোপন করিয়া বলিল,—

"তুমি বলিয়াছিলে, হাফেজ রহমতের কন্যাকে জগদম্বাবেগম বড় ভাল বাসিতেন। তিনি তাহাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত কোন চেষ্টা করিলেন না কেন?"

তোফানী। সোবান আল্লা! সে কথা তোমার কাছে বলিতে তো ভুলিয়াগিয়াছি। আজ নবাব বাড়ী আসিবেন বলিয়া, যখন আমি এরফানী, আর লোতমানী আতরদান গোলাপদান সাফ করিতে ছিলাম, তখন আমাদের বেগম এবং বুড়া বেগমের কাছে জগদম্বা বেগম আসিয়া বলিলেন যে, আজ সুজা বাড়ী আসিবেন, হাফেজের মেয়েকে তফাত্ কর। বেগমেরা তাহার কথা শুনিলেন না। তখন জগদম্বা বেগম কত কত কথা বলিল, তা সকল আমার মনেও নাই। তুমি সে দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি না যে তাহার জগদম্বা নাম হইল কেন? সেই কথাটা যখন বলিতে আরম্ভ করিল, তখন আমি কাণদিয়া তাহা শুনিতে লাগিলাম। যে জন্য তাহার এই কাফেরি নাম হইয়াছে, তাহা এখন জানিতে পারিয়াছি।

অমর সিংহ। কি জন্য তাঁহার জগদম্বা নাম হইয়াছে?

তোফানী। ঐ জগদম্বা বেগমের পূর্ব্ব নাম মেহেরউন্নিসা ছিল। বিবাহের সময় আর একটা কি নাম হইল। ওর স্বামী পুত্রের সঙ্গে ওর মিল ছিল না। ওর পুত্রের নাম মীরণ মিঞা ছিল সেই মীরণ, জগদম্বা নামের একটা বুড়া বামনী আর জগদম্বার পুত্রবধূ আর কন্যাকে গঙ্গার ঘাট হইতে ধরিয়া আনিয়াছিল। জগদম্বা বেগম সেই জগদম্বা বামনীর চীৎকার শুনিয়া তাহাকে এবং তাহার পুত্রবধূ এবং কন্যাকে মীরণের হাত হইতে বাঁচাইল। মীরণ আর তাহাদিগের কিছু করিতে পারিল না। পরে সেই বুড়া বামনীর স্বামী একটা বাঁদী দ্বারা বুড়া বামনীকে গলায় দড়ী দিয়া মরিতে বলিয়া পাঠাইল। বুড়া বামনীর স্বামী পুত্র জামাতা গঙ্গায় ডুবিয়া মরিল। বুড়া বামনী বলিল যে আমি গলায় দড়ী দিয়া কখনও মরিব না। আমার স্বামী পুত্র জামাতা গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহারা ভূত হইয়া গাছে গাছে থাকিবে। আমি বার বৎসর পরে তাহাদের পিণ্ড দিয়া পরে মরিব। পরে এই জগদম্বা বেগম বুড়া বামনীকে তাহার কন্যা এবং পুত্রবধূসহ কাশীতে পাঠাইয়াছিল। তাহারা এখনও কাশীতে আছে। সেই বুড়া বামনী কাশী যাইবার সময় বলিয়াছিল, যে, আমি যদি সতী হই, তবে মীরণ বিনা মেঘে বজ্রপাত হইয়া মরিবে। ইহার কয়েক দিন পরে সত্য সত্যই বিনা মেঘে বজ্রপাত হইয়া মীরণের মৃত্যু হইল। তখন মীরণের মা মনে করিল, যে, এই বামনী আসল খোদার রসুল কি পেগাম্বর হইবে। সেই জন্য নিজের নাম ছাড়িয়া দিয়া, বুড়া বামনীর কাফেরি নাম নিজে নিয়াছে।

অমরসিংহ বিশেষ একাগ্রতার সহিত তোফানীর এই সকল কথা শ্রবণ করিতে ছিল। তোফানীর বাক্যাবসানে সে স্পন্দহীন পুত্তলের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এ স্বপ্ন। "আমার জননী স্ত্রী এবং ভগ্নী আপন আপন ধর্ম্ম সংরক্ষণ পূর্ব্বক পরম পবিত্র কাশীধামে অবস্থান করিতেছেন। এ জীবনেই আমার তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। হাফেজবালার উদ্ধারার্থ আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম বলিয়াই কি ভগবান আমাকে তাহারই পুরস্কার প্রদান করিলেন? হা পরমেশ্বর তোমার ইচ্ছায় কি না হইতে পারে।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অমর সিংহের মনে বিবিধ প্রকারের আবেগের উদয় হইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার ইচ্ছা হইল যে সে একবার হাফেজনন্দিনীর মৃতশব দেখিবে।

তোফানী অমরসিংহকে তদবস্থ দেখিয়া, বারম্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তুমি চুপ করিয়া রহিলে কেন?"

অমরসিংহ তোফানীর সে প্রশ্নের কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া, হাফেজ-নন্দিনীকে কোথায় সমাধিস্থ করিতে লইয়া গিয়াছে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিল।

তোফানী বলিল "খোর্দ্দ মহলের পশ্চিমদিকের বাগিচায় তাহাকে কবর দিবে।"

অমরসিংহ। খোর্দ্দমহলটা কোন দিকে?

তোফানী। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ যে বাড়ী দেখা যায়,—ঐটা খোর্দ্দমহল।

অমরসিংহ আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া, তৎক্ষণাৎ খোর্দ্দমহলের দিকে ধাবিত হইল।

তোফানী তাহাকে হঠাৎ এই প্রকার দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, কতকদূর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু অমরসিংহের অনুসরণ করিবার সাধ্য হইল না। অমরসিংহ অত্যন্ত দ্রুতপদে চলিয়াছে। অত্যল্প সময় মধ্যে অমরসিংহ প্রায় অদৃশ্য হইল। তোফানী পশ্চাৎ হইতে প্রথমতঃ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"কোথায় চলিলে, কোথায় চলিলে?"

কিন্তু অমরসিংহ একবারে অদৃশ্য হইলে পর, সে আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—"সোবান্ আল্লা! এত কষ্ট করিয়া আজ এই গোলমালের মধ্যেও অন্দরের বাহিরে আসিলাম; কিন্তু আমাদের আসল কথার কিছুই ঠিক হইল না।"

অনেকক্ষণ তোফানী পুষ্করণীর পারে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। এক একবার সে মনে করিতে লাগিল যে, হয়তো অমরসিংহ এখনই আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। সে অমর সিংহের বর্ত্তমান আচরণের মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থা হইল না। কিন্তু যখন দেখিল যে, এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টার মধ্যেও অমরসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিল না, তখন সে কোপাবিষ্ট হইল, এবং অমর সিংহকে লক্ষ্য করিয়া গালিবর্ষণ করিতে করিতে অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আপন শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশানন্তর আপনা আপনি বলিল, "শালা বামন্, আবার কাল বৈকালে যখন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে, তখন বুঝিবে তোফেজ্জান উন্নিসা কেমন লোক। তোমাকে আচ্ছা শাস্তি দিব।"

পঞ্চদশ অধ্যায়।

উত্তেজিত মন।

অমর সিংহের মন এখন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছে। হর্ষ, বিষাদ, ঘৃণা, দয়া এবং বিদ্বেষ সকল প্রকারের বিরুদ্ধ হৃদয়াবেগে তাহার মন উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

হাফেজ নন্দিনীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে তাহার মন বিষাদে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সেই বিষাদের সঙ্গে সঙ্গে আবার হাফেজ নন্দিনীর বীরত্বের বিষয় চিন্তা করিয়া মন আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। হাফেজ নন্দিনী পিতৃ-বৈরী বিনাশ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। মানব জীবনে ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর সুখের বিষয় কি হইতে পারে?

সুজা উদ্দৌলার প্রতি তাঁহার বড় ঘৃণা উপস্থিত হইল। জগদম্বা বেগমের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা হইল। জগদম্বা বেগমের সাহায্যেই তাহার জননী, ভগ্নী এবং স্ত্রী আপন ধর্ম্ম রক্ষণে কৃতকার্য্য হইয়া, এখন পরম পবিত্র কাশীধামে বাস করিতেছেন। জগদম্বা বেগম তাহার জননীকে দেবতা বলিয়া মনে করেন, তাহার জননীর নাম পর্য্যন্ত ধারণ করিতেছেন। তাহার জননী সত্য সত্যই দেবতা। তাঁহার অভিসম্পাতে বিনা মেঘে বজ্রপাত হইয়া, মীরণের মৃত্যু হইয়াছে। এখন কাশীধামে চলিয়া গেলেই আপন জননী ভগ্নী এবং স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কি সুখের বিষয়! এই চিন্তা অমরসিংহের অন্তরে আনন্দবারি বর্ষণ করিতে লাগিল।

এই সকল চিন্তার স্রোতে তাহার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িল। সেই উত্তেজিত মনে সে হাফেজ নন্দিনীর মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত দ্রুত-পদে খোর্দ্দ মহলের পশ্চিমদিকের বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই চারি পাঁচ জন লোককে মৃত্তিকা খনন করিতে দেখিল। অমর সিংহ সেই লোকদিগের নিকটে যাইতে উদ্যত হইলে, তাহাদের মধ্যে দুইজন লোক তাহাকে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত সম্মুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু তরবারি হস্তে অমর সিংহকে সিপাহীর পরিচ্ছদে সুসজ্জিত দেখিয়া, গোলাম দ্বয় সহসা তাহার গাত্রস্পর্শ করিতে সাহস করিল

না। তাহারা দুইজন তাহাদিগের সঙ্গী অন্য তিনজন লোকের নিকট যাইয়া বলিল, "একজন সিপাহী আসিতেছে।"

তখন তাহারা পাঁচ ছয় জন একত্র হইয়া, অমর সিংহের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে, কি চাহ ?"

অমর সিংহ বলিল, "আমি কিছু চাইনা। তোমরা গোপনে কাহার মৃতশব এখানে আনিয়াছ, তাহা দেখিয়া যাইব।"

উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে হোসেন খাঁ সকলের অগ্রে আসিয়া বলিল, "নবাবের অন্দরের এক জন বাঁদীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহাকে আমরা কবর দিতে আসিয়াছি।"

অমরসিংহ। আমি সে বাঁদীকে একবার দেখিতে চাই।

হোসেন খাঁ। আমরা সে বাঁদীর লাস্ কাহাকেও দেখাইব না। ইহার লাস্ কাহাকেও দেখাইতে উজীর মার্ত্তুজা খাঁ নিষেধ করিয়াছেন।

অমরসিংহ। আমি উজীর মার্ত্তুজা খাঁর হুকুম মানিনা। আমাকে এই মৃতের শব না দেখাইলে, (হস্তস্থিত তরবারি দেখাইয়া) এই তরবারি দ্বারা তোমাদের পাঁচ জনেরই মাথা কাটিয়া ফেলিব।

অমরসিংহের কথা শুনিয়া, ভৃত্যদিগের একটু ভয় হইল। তাহারা বলিল, "আপনি তবে এই মরা বাঁদীটাকে একবার দেখিয়া শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। মার্ত্তুজা খাঁ যেন ইহা শুনিতে না পায়েন। তিনি শুনিতে পাইলে নিশ্চয়ই আমাদের মাথা কাটা যাইবে।"

অমরসিংহ তখন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, হাফেজবালার মৃতদেহের নিকট যাইয়া দাঁড়াইল।

অলৌকিক রূপ লাবণ্য পরিপূর্ণ সেই ক্ষুদ্র দেহখানি ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছে। চির হাস্যময় মুখ খানি হইতে এখনও যেন মৃদু মৃদু হাসি বাহির হইতেছে। চন্দ্রের রশ্মিজাল সে মুখ কমলে নিপতিত হইয়া শত গুণে সে মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি করিয়াছে। যে হস্ত খানি দ্বারা বুকে ছুরিকা বসাইয়া দিয়াছিলেন, সেই দক্ষিণ হস্তখানি এখনও বুকের উপরই রহিয়াছে। হেকিম আমজেদআলি খাঁ ছুরী খানি কেবল হাত হইতে খসাইয়া নিয়াছিলেন। কিন্তু হাত খানি সেই ভাবেই পড়িয়া আছে।

অমরসিংহ অনিমেষ নেত্রে সেই স্পন্দহীন, বাক্যহীন মুখ খানির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে হোসেন খাঁ আসিয়া বলিল, "সিপাহী সাহেব, আমাদের গর্ত্ত খনন করা হইয়াছে। এখন আপনি চলিয়া যান। মার্ত্তুজা খাঁ জানিতে পারিলে, আমাদের মাথা কাটিয়া ফেলিবে।"

অমরসিংহ তখন আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া, সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল। দুই চারি মিনিট পরেই সে প্রকাশ্য রাস্তায় আসিয়া উঠিল। রাস্তায় উঠিয়াই ছত্রসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে সেই ভগ্ন গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে গৃহে আসিয়া পৌঁছিল। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, ছত্রসিংহ সেখানে নাই। শূন্য গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথমতঃ গৃহের এদিক ওদিক ছত্রসিংহের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে কোথাও পাইল না। তখন আবার গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক একটু বিশ্রাম করিতে লাগিল।

অমরসিংহের মন এখনও বিবিধ চিন্তায় উদ্বেলিত হইতে ছিল। এখন পর্য্যন্তও তাহার উত্তেজিত মন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই; বরং ক্রমেই অপেক্ষাকৃত অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। অমরসিংহ ছত্রসিংহকে দেখিতে না পাইয়া, একবার মনে করিল যে, ছত্রসিংহের অনুসন্ধানে আবার বাহির হইবে। কিন্তু আরার ভাবিয়া চিন্তিয়া সে সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্রমার্থ একখানি কম্বল পাতিয়া শয়ন করিল। মনে করিল একটু নিদ্রা হইলেই শরীরের ক্লান্তি দূর হইবে।

কিন্তু আজ আর অমরসিংহের চক্ষে নিদ্রা নাই। শত চেষ্টা করিয়াও সে নিদ্রা যাইতে পারিল না। মন এইরূপ উত্তেজিত হইয়া পড়িলে মানুষের কখন নিদ্রা হয় না। অমরসিংহ শয্যা হইতে আবার উঠিল। ভগ্ন গৃহের বারেন্দায় যাইয়া একবার এদিকে আবার ওদিকে হাঁটিতে লাগিল। এইরূপ হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার উত্তেজিত মনে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল,—

—"এখন আর হাফেজনন্দিনীর বিষয় ভাবিলে কি হইবে? তিনি দেববালা ছিলেন। পিতৃবৈরী বিনাশ এবং নারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়া স্বর্গে চলিয়া

গিয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। তাঁহার নিমিত্তে শোক করিবার কোন কারণ নাই।

"কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শ্রীনিবাস পণ্ডিতের একটি কথাও নিষ্ফল হইবার নহে। শ্রীনিবাস পণ্ডিত দেবতা। তিনি বলিয়াছেন, স্বার্থ-পরতা এবং কাপুরুষতা পরিহার পূর্ব্বক সংসারের অপরাপর লোকের হিত সাধনার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিলেই মানুষ সকল সুখের অধিকারী হইতে পারে। আজ আমার জীবনে তাঁহার কথা সম্পূর্ণ ফলিয়াছে।

"আমি কোন পুরস্কারের কামনা করিয়া, হাফেজ নন্দিনীর নিমিত্ত প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতে যাই নাই। শুদ্ধ কেবল তাঁহারই উপকারার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু এই সদভিপ্রায় মনে স্থান প্রদান করিয়াছিলাম বলিয়াই কি পরমেশ্বর আমাকে আশাতিরিক্ত সুখশান্তি প্রদান করিলেন? স্নেহময়ী মাতার শ্রীচরণ যে আর এ জীবনে দেখিতে পাইব, এইরূপ আশা তো আমার কোন দিনও ছিল না। যে আশালতা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল, আজ আবার তাহা ফল ফুলে পুনর্জীবিত হইল। এখন কাশী-ধামে চলিয়া গেলে, বোধ হয় নিশ্চয়ই জননী, ভগ্নী এবং স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তাঁহারা নরপিশাচের হাতে পড়িয়াও আপন আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। পরম পবিত্র কাশীধামে এই চৌদ্দ বৎসর যাবত্ বাস করিতে-ছেন। জনকাত্মজা বৈদেহী রাক্ষসপতির হস্তে নিপতিত হইয়াও যদ্রূপে আপন সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, আমার জননী, ভগ্নী এবং স্ত্রীও সেই প্রকারে ধর্ম্ম রক্ষণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আর আমার সুখের বিষয় কি হইতে পারে? রাজপদপ্রাপ্তি অপেক্ষাও এই শুভ সংবাদ আমাকে অধিকতর বিমলানন্দ প্রদান করিতেছে।

"ধন্য পিতা নেহাল সিংহ! আমি তাঁহার চরণে বারম্বার প্রণিপাত করি। নেহাল সিংহই আমার প্রকৃত পিতার কার্য্য করিয়াছেন। তিনি অস্ত্র শিক্ষা প্রদান না করিলে, তাঁহার উত্তেজনায় সাংগ্রামিক জীবন অবলম্বন না করিলে, আমার হৃদয়ের কাপুরুষতা এবং নীচাশয়তা কখনই বিদূরিত হইত না। আমি এই সুখ শান্তি লাভের অধিকারী হইতে পারিতাম না।

"পিতা বাল্যকাল হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত সাহিত্য ন্যায়, দর্শন, বেদ বেদান্ত ইত্যাদি সকল শাস্ত্রই আমাকে শিখাইয়া ছিলেন। কিন্তু সে শাস্ত্রধ্যয়ন দ্বারা কি আমার হৃদয়ের কাপুরুষতা দূর হইয়াছিল?

"আমার সতের বৎসর বয়সের সময় আমার সাক্ষাতে আমার জননী ভগ্নী এবং স্ত্রীকে নরপিশাচেরা ধরিয়া লইয়া গেল। আর আমি ভয় ও ত্রাসে চুপ করিয়া রহিলাম। কি ঘৃণিত জীবন! কি ঘৃণিত কার্য্যই করিয়াছিলাম!

"দূর হউক ন্যায় শাস্ত্র। অধঃপাতে যাউক দর্শন। ন্যায় ও দর্শন অধ্যয়ন দ্বারা মানুষ কখন মানুষ হইতে পারে না। এ সংসার হইতে ন্যায়, দর্শন, সাহিত্য, বেদ, বেদান্ত বিলুপ্ত হউক,—বিনষ্ট হউক। ন্যায়-প্রণেতা দর্শন-প্রণেতা—তোমরা অধঃপাতে যাও। এ সংসারে যেন তোমাদের নাম কেহ শুনিতে পায় না। তোমরা ন্যায় দর্শন প্রণয়ন করিয়া জগতের কি উপকার করিয়াছ?

"আমি আর ন্যায় দর্শন স্পর্শও করিব না। ন্যায় শাস্ত্রের খাতা যেখানে পাইব পুড়াইয়া ফেলিব। দূর হউক শাস্ত্র। সংসারে শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই। সংসারে কেবল শস্ত্র চাই। শস্ত্র মস্তকে বহন করিব—শাস্ত্র পদতলে দলন করিব।"

অমর সিংহ মনে মনে এইরূপ বলিতে বলিতে, "শাস্ত্র পদতলে দলন করিব" বলিয়া ভূমিতলে পদাঘাত করিবামাত্র ছত্রসিংহের গাঁজার কল্‌কী তাহার পদতলে পড়িয়া মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ছত্রসিংহ বোধ হয় গৃহ হইতে বাহিরে যাইবার সময় গাঁজায় দম দিয়া কল্‌কী ভুল ক্রমে বারেন্দায় ফেলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ সে কল্‌কী এখন অমর সিংহের পদতলে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

কল্কী পদতলে পড়িবামাত্র অমর সিংহের চিন্তার স্রোতে একটু বাধা পড়িল, মনের উচ্ছ্বসিত বেগ একটু থামিল। অকস্মাৎ ছত্রসিংহের গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস মনে পড়িয়া একটু ঘৃণা উপস্থিত হইল। তখন চিন্তার স্রোত আবার অন্যদিকে চলিল। অমর সিংহ একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার মনে মনে বলিতে লাগিল,—

"না, বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। অনর্থক শাস্ত্র প্রণেতাদিগকে নিন্দা করিলাম। উত্তেজিত মনের বেগ যেদিকে ধাবিত হয়, সেইদিকেই চলিতে থাকে। উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ কোন বিষয়ের এপক্ষ ওপক্ষ উভয় পক্ষ দেখিতে পায় না। এক পক্ষই কেবল দেখে।

"শাস্ত্র শিক্ষা ভিন্ন কেবল শস্ত্র শিক্ষা দ্বারা মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে

পারেনা। শাস্ত্র শস্ত্র উভয়েরই প্রয়োজন রহিয়াছে। ছত্রসিংহ অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে; তাহার হৃদয়ও অত্যন্ত দয়াশীল; কিন্তু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তো সে কিছুই অবধারণ করিতে পারে না। সে এক প্রকার পশু জীবন যাপন করিতেছে।

"আমি যদি বাল্যকালে শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিতাম, তবে পরে এই অস্ত্র শিক্ষা দ্বারা আমার জীবনে কি কি লাভ হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে সমর্থ হইতাম না।

"কি অন্যায় কার্য্য করিলাম। শাস্ত্র পদতলে দলন। আমার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইল। এ সংসারের পাপ ও অত্যাচার সময়ে সময়ে মানুষকে এতদূর উত্তেজিত করে, যে, মানুষ একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে। এ সংসারে অন্যের পাপ অন্যের অত্যাচার আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিতেছে।

"আজ সুজাউদ্দৌলার অত্যাচার আমাকে এতদূর উত্তেজিত করিয়াছে যে, আমি আত্ম বিস্মৃত হইয়া শাস্ত্রকারদিগকে নিন্দা করিলাম, শাস্ত্রের নিন্দা করিলাম। শাস্ত্র নিন্দা দ্বারা লোকের অধোগতি হয়। নিশ্চয়ই আমার অধোগতি হইবে।

"হে শাস্ত্র প্রণেতৃগণ, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। আমি মনের উত্তেজিত অবস্থায় তোমাদিগকে নিন্দা করিয়াছি। ক্ষমা কর,—ক্ষমা কর—ক্ষমা কর।"—

অমর সিংহ যখন চিন্তায় একেবারে নিমগ্ন হইয়া, ভগ্ন গাঁজার কল্কীর নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, তখন তাহার মুখ হইতে স্পষ্টরূপে "ক্ষমা কর—ক্ষমা কর" এই শব্দ কয়েকটী আপনা আপনি নির্গত হইতে ছিল। এই সময়ে অকস্মাৎ ছত্রসিংহ দ্রুতপদে সেখানে আসিয়া অমর সিংহের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—

"ভাই তুমি এতো দুঃখিত হইয়াছ কেন? তুমি বারম্বার আমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছ কেন? আমি যে তোমাকে জীবিতাবস্থায় দেখিতে পাইলাম, সেই আমার সৌভাগ্য। তুমি আমার পঞ্চাশ খানা গাঁজার কল্কী ভাঙ্গিলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করিব। একখানা গাঁজার কল্কী না হয় ভাঙ্গিয়াই গিয়াছে। তাহাতে আর কি ক্ষতি হইবে? তোমার প্রাণ নষ্ট করিয়া নবাবের লোকেরা তোমাকে কবর দিয়াছে, তাই শুনিয়াই আমি

বড় ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছি। তোমার মৃতদেহ কবর হইতে উঠাইবার নিমিত্ত কেবল কোদালী তল্লাসকরিতে ছিলাম। কিন্তু আমি যাহা শুনিয়াছি সে সকলই মিথ্যা। এখন তোমাকে দেখিতে পাইয়া আমার সকল দুঃখ দূর হইল।"

এইরূপ বলিতে বলিতে ছত্রসিংহ অমরসিংহকে আপন বুকের মধ্যে টানিতে লাগিল।

অমরসিংহ তাহার বর্ত্তমান আচরণের মর্ম্ম ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া, অবাক্ হইয়া রহিল। কিছু কাল পরে অমরসিংহ ছত্রসিংহকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে? আমি তোমার কথার তো কিছু অর্থ বুঝিতে পারি না।"

ছত্রসিংহ তাড়াতাড়ী বলিল, "ভাই, আমি মনে করিয়াছিলাম নবাব বাড়ীর লোকেরা তোমার প্রাণবধ করিয়া, তোমাকেই গোরস্থানে নিয়া কবর দিয়াছে। তাই তোমার মৃত শব কবর হইতে উঠাইবার নিমিত্ত সমস্ত রাত্র কেবল কোদালী তল্লাস করিয়াছি। কিন্তু এখানে আসিয়াই তোমাকে দেখিতে পাইলাম। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত তোমার কাছে আসিলেই, তুমি আমার দিকে চাহিয়া "ক্ষমা কর—ক্ষমা কর"—বলিতেছিলে। তুমি বারম্বার ক্ষমা চাহিতেছ কেন? না হয় আমার একখানা গাঁজার কল্কী ভাঙ্গিয়াই গিয়াছে। কল্কী খানা ভাঙ্গিয়াছ বলিয়া কি আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিব। কল্কী ভাঙ্গিয়াছ বলিয়া তোমার মনে বুঝি বড় ভয় হইয়াছিল যে, পাছে আবার সে বৎসরের ন্যায় এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড উপস্থিত হইবে। ভাই, তোমার কিছু ভয় নাই। আমি তোমাকে কিছুই বলিব না। সে বৎসর এরফান্ আলির সেই ছোকরা ইচ্ছা পূর্ব্বক আমার কল্কী খানা ভাঙ্গিয়াছিল। তাই সেই দুষ্ট ছোঁড়াকে এক চপেটাঘাত প্রায় যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলাম।"

অমরসিংহ ছত্রসিংহকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে? কাহার নিকট শুনিয়াছিলে যে নবাবের লোকেরা আমার প্রাণ বধ করিয়াছে?"

ছত্রসিংহ বলিল, "তুমি প্রথম রাত্রে আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলে পর, আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, 'আজ তো তুমি স্ত্রীলোকের বেশে নবাবের অন্দরের মধ্যে যাইয়া তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিবে। কিন্তু অন্দরের

মধ্য হইতে তুমি আপন প্রাণ বাঁচাইয়া বাহির হইতে পার, কি না, তাহাই জানিবার জন্য বড় ইচ্ছা হইল। আমি সেই জন্য তোমার পিছে পিছে নবাব বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলাম। তুমি বলিয়া গিয়াছিলে যে, নবাব বাড়ীর নিকটস্থ একটা পুষ্করিণীর পারে তোমার সহিত সেই বাঁদী-টার সাক্ষাৎ হইবে। আমি নবাব বাড়ীর নিকট যাইয়া, সেই পুষ্করণী তল্লাস করিতে লাগিলাম। অবশেষে সদর রাস্তার দক্ষিণ দিকে একটা পুকুর দেখিতে পাইয়া, সেই পুকুরের পারে যাইয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু তোমাকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না।''

অমর সিংহ ছত্রসিংহের কথায় বাধা দিয়া বলিল, ''সদর রাস্তার উত্তর দিকের পুষ্করিণীর পারে যাইয়া আমি অপেক্ষা করিতেছিলাম। তুমি ভুল ক্রমে দক্ষিণ দিকের পুষ্করিণীর পারে গিয়াছিলে। তাহাতেই আমাকে দেখিতে পাও নাই।"

ছত্রসিংহ বলিল, ''তবে তাহাই হইবে। আমি সেই দক্ষিণ দিকের পুষ্করিণীর চারি পারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও তোমাকে আর দেখিতে পাইলাম না। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সেই পুষ্করিণীর নিকট দিয়া উজীর মার্ত্তুজা খাঁকে দক্ষিণ দিকে যাইতে দেখিলাম। মার্ত্তুজা খাঁর সঙ্গে মাত্র একটি লোক লণ্ঠন হাতে করিয়া যাইতেছিল। আমি বড় আশ্চর্য্য হইলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, মার্ত্তুজা খাঁ এই ভাবে গোপনে কোথায় চলিয়াছে? মার্ত্তুজা খাঁকে কোথাও যাইতে হইলে তাহার আগে পাছে পঞ্চাশ জন লোক চলে।

''ইহার প্রায় এক ঘণ্টা পরে মার্ত্তুজা খাঁ আর এক জন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া পুনর্ব্বার নবাব বাড়ী ফিরিয়া চলিল।

''মার্ত্তুজা খাঁর সঙ্গী সেই ভদ্র মুসলমানটিকে আমি আর কখন দেখি নাই। সে কে তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু মার্ত্তুজা খাঁ এবং সেই ভদ্রলোক চুপি চুপি কথা বলিতে বলিতে যাইতে ছিল। পথে পথে মার্ত্তুজা খাঁ সেই ভদ্রলোকটিকে বলিল, ''হেকিম সাহেব, নবাবের শরীরেতো বড় অধিক জখম হয় নাই। একটু ক্ষুদ্র জখম হইয়াছে। বুঝিতে পারি না, ইহাতে নবাব কেন এত ছট্ ফট্ করিতেছেন। আর যে জখম করিয়াছে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।''—

''এই কথা শুনিয়াই আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি তখন মনে করি-

লাম যে, নবাবের প্রাণবধ করিতে যাইয়া, তুমি তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে পার নাই, কেবল ক্ষুদ্র জখম করিয়াছ। কিন্তু তোমার প্রাণ তাহারা নষ্ট করিয়াছে।

"তোমার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া, আমার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু তোমার মৃত শব দেখিবার নিমিত্ত বড় ইচ্ছা হইল। আমি সেই জন্য নবাব বাড়ীর সদর দরজার বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইলাম। মনে করিলাম, সদর দরজা দিয়াই তোমার মৃত শব বাহিরে লইয়া যাইবে। কিন্তু দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেও কাহাকে কোন মৃত শব বাহিরে লইয়া যাইতে দেখিলাম না। তখন মনে করিলাম যে হয়তো প্রাতঃকালে তোমার মৃত শব বাহির করিবে।

"এইরূপ মনে করিয়া, আমি খোর্দ্দমহলের নিকটস্থিত রাস্তা দিয়া সোজা পথে এই গৃহে আসিতেছিলাম। পথে দেখিলাম, চারি পাঁচ জন লোক কোদালী হাতে করিয়া, নবাব বাড়ীর দিকে যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে একটা লোক সঙ্গী অন্যান্য লোকের নিকট বলিল, "এটা বুঝি কাফের ছিল। নহিলে কবর দেওয়ার সময় মোল্লা সাহেবকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিত।"—

"দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "কাফের না হইলে, গোর স্থানে কবর না দিয়া এই আম বাগানে কবর দিবে কেন?"—

"ইহাদের কথা শুনিয়া আমার নিশ্চয়ই বোধ হইল যে, এই কয়েক জন লোক তোমার মৃত শরীর নিকটস্থিত আম বাগানের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া রাখিয়াছে।

"আমি তখন খোর্দ্দ মহলের পশ্চিম্ দিকের আম বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক যে সেখানে নূতন গর্ত্ত করিয়াছে, তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। সেই গর্ত্তই তোমার কবর মনে করিয়া, তাহার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে হইল যে, তুমি নিজের প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়াও বক্সারের যুদ্ধের সময় আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছিলে। আর এখন আমি কি তোমার মৃত শরীর দাহ না করিয়া, এই ভাবে ফেলিয়া যাইব? আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, কবর হইতে তোমার মৃত শরীর উঠাইব। পরে গঙ্গার পারে তোমার শরীর জ্বালাইয়া দিয়া এখান হইতে চলিয়া যাইব।

"এই স্থির করিয়াই একখান কোদালী লইয়া যাইতে এখানে আসিয়াছি! কিন্তু এখানে আসিয়াই তোমাকে দেখিতে পাইলাম। তুমি বুঝি আমার গাঁজার কল্কী খানি ভাঙ্গিয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছ। ভাই, তোর ভয় নাই। তুই নবাবকে জখম করিয়া যে আপন প্রাণ বাঁচাইয়া আসিয়াছিস্, সেই আমার সুখের বিষয়। এখন চল, আমরা এই রাত্রেই পলায়ন করি; নহিলে আবার কাল সকালে তোমাকে ধৃত করিতে আসিবে।"

অমরসিংহ ছত্রসিংহকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিল,—"তোমার ভয় নাই। আমি নবাবকে জখম করি নাই। নবাবের অন্দরের মধ্যে আমি প্রবেশ করিতেও পারি নাই। নবাব রাত্রে শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক হাফেজনন্দিনীকে সেখানে আনাইয়াছিলেন। কামাসক্ত নর পিশাচ হাফেজবালার হস্ত ধরিতে উদ্যত হইলে, তিনি আপন কেশ রাশির মধ্য হইতে এক বিষাক্ত ছুরিকা বাহির করিয়া তদ্দ্বারা প্রথমতঃ নবাবকে আঘাত করিলেন, তৎপরে সেই ছুরী স্বীয় বক্ষে সংবিদ্ধ করিয়া আত্ম-হত্যা করিয়াছেন। খোর্দ্দমহলের পশ্চিম দিকের অম্র বাগানে তুমি যে নূতন কবর দেখিয়া আসিয়াছ, সে হাফেজবালার সমাধিস্থান। আমি স্বচক্ষে হাফেজবালার মৃত দেহ সেখানে দেখিয়া আসিয়াছি।"

ছত্রসিংহ অশিক্ষিত হইলেও তাহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল। হাফেজ বালার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে তাহার হৃদয় বড়ই বিগলিত হইল। সে কিছু উত্তেজিত হইয়া বলিল,—"তবে শালা উজীরের মৃত্যু হয় নাই? শালাকে খুন না করিয়া, আমরা এখান হইতে যাইব না। এমন সুন্দরী মেয়েটী মরিয়া গেল। এই শালার জন্যই তো মেয়েটী মরিল। শালাকে অবশ্য খুন করিতে হইবে। ভাই অমর, এবার শালা উজীরকে খুন করিবার ভার আমি লইলাম। তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। তোমার অল্প বয়স। তুমি বাঁচিয়া থাক। আমার ষাট বৎসর বয়স হইয়াছে, আমার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, আমি না হয় এখন মরিব।"

অমর সিংহ ছত্রসিংহকে থামাইয়া, বলিল যে, উজীর সুজউদ্দৌলাকে আর খুন করিতে হইবে না। হাফেজ নন্দিনীই তাঁহার পিতৃবৈরী বিনাশ করিয়া গিয়াছেন। যে ছুরিকা দ্বারা তিনি নবাবকে জখম করিয়াছেন, সে ছুরীর অগ্রভাগে বিষছিল। হেকিম আমজেদ্ আলি খাঁ সে বিষ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, ছয় কি সাত মাসের অধিক উজীর বাঁচিবেন না।

ছুরিকার অগ্রভাগের বিষ শরীরের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে কখন সাপের বিষের ন্যায় কার্য্য করে ; আর বিষের পরিমাণ অল্প হইলে শরীরের সমুদয় মাংস ক্রমে পচিয়া যায়। নবাবের শরীরের মাংস ক্রমে পচিতে থাকিবে। পরে তাঁহার মৃত্যু হইবে।

অমরসিংহের এই কথা শুনিয়া ছত্রসিংহ বলিল, "তবে ভালই হইয়াছে। কিন্তু এখন কি করিবে বল।"

অমরসিংহ বলিল, "দাদা, ভগবান আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এখন সকল সুখেরই অধিকারী করিয়াছেন। এই বর্ত্তমান ঘটনা উপলক্ষে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার জননী ভগ্নী এবং স্ত্রী জীবিত আছেন। তাঁহারা সকলেই আপন আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া, পরম পবিত্র কাশীধামে বাস করিতেছেন। এখন প্রথমতঃ প্রয়াগে যাইয়া দিদি চাঁদকুমারীকে সঙ্গে করিয়া কাশীধামে চলিয়া যাইব। আর এই অর্থলোভী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরী করিব না। চল, রাত্রি প্রভাতেই আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই।"

ইহার পর ছত্রসিংহ অমরসিংহের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিল। উভয়ই অত্যন্ত আনন্দিত হইল। ইহারা দুইজনে চাকরি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া যাওয়াই স্থির করিল। ইহাদের কথোপকথনে রাত্রি অবসান হইল। অদ্যকার নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে অমরসিংহের জীবনের অমানিশা অবসান হইল। তাঁহার জীবন-গগণে পারিবারিক সম্মিলন-সুখ-সূর্য্যের উদয় হইল। এ সুখ সূর্য্য জীবন থাকিতে কখন অস্ত হয় না। সদাচারী ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবনে এ সুখ সূর্য্যের মধ্যাহ্নও নাই অপরাহ্নও নাই। সর্ব্বদাই প্রভাত সূর্য্য বলিয়া বোধ হয়। এ প্রভাত সূর্য্য হইতে সর্ব্বদাই হৃদয় প্রফুল্লকর প্রভাতরশ্মি বিকীর্ণ হইতে থাকে। সেই চিরপ্রভাত রশ্মি নিবৃত্তিসম্ভূত শান্তিস্বরূপ প্রভাত সমীরণ সহ সম্মিলিত হইলেই, গৃহীর জীবন সর্ব্বদা আনন্দের হিল্লোলে ভাসিতে থাকে।
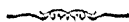
ষোড়শ অধ্যায়।

বারাণসী।

আষাঢ় মাস। বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। গঙ্গা বেগে প্রবাহিত হইতেছে। বরুণা জলশূন্য ছিল। আজ কাল বরুণাও জলে পরিপূর্ণ। এখন দিন দিনই গঙ্গার বেগ বৃদ্ধি হইতেছে। গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বে পঞ্চ ক্রোশী কাশী। কাশীতে গঙ্গার পারে স্থানে স্থানে প্রস্তর এবং ইষ্টক নির্ম্মিত শত শত ঘাট রহিয়াছে। এখন গঙ্গায় তট পর্য্যন্ত জল। নদী গর্ভস্থ এবং উভয় পার্শ্বস্থিত চর সকল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাটের নিম্নের সমুদয় সিঁড়ীই জল নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কেবল দুই একটী সিঁড়ী জলের উপরে দেখা যায়।

ফাল্গুন চৈত্র মাসে নদী হইতে উপরে উঠিতে হইলে, সিঁড়ী বাহিয়া উঠিতে হয়। মনে হয় যেন নিম্ন ধরাতল হইতে পর্ব্বতে উঠিতেছি। কিন্তু এখন বর্ষাকালে নদীর জল বৃদ্ধি হইয়াছে। নদী হইতে পারে উঠিতে হইলে, এখন আর সিঁড়ী বাহিতে হয় না।

প্রাতঃকালে কাশীর প্রত্যেক ঘাটই লোকারণ্যে পরিপূর্ণ থাকে। এ লোকারণ্যের কোলাহল বেলা দশ ঘটিকার পূর্ব্বে আর শেষ হয় না। কেহ স্নান করিয়া উঠিয়া, পিতৃ পিতামহের তর্পণ করিতেছেন। কেহ স্নানের পর ঘাটে বসিয়া স্তব পাঠ করিতেছেন। কোন কোন ঘাটে বসিয়া পণ্ডিতগণ এবং বৈদিকগণ বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন; নানাছন্দে সামবেদ গান করিতেছেন। কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। ইহাদের কাহারও মুখের উচ্চারিত কথা সুস্পষ্ট রূপে বুঝিবার সাধ্য নাই। গঙ্গার পারে দাঁড়াইলে, কেবল বিবিধ প্রকারের অস্পষ্ট শব্দ কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু সেই অস্পষ্টশব্দ এক প্রকার সঙ্গীতের ন্যায় বোধ হয়। সে এক মনোহর সঙ্গীত। বায়ুতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের উচ্চারিত শব্দ সংমিলিত হইয়া এক মধুর সঙ্গীত উৎপাদন করিতেছে। বিশেষ চিন্তা এবং মনোযোগ পূর্ব্বক এ সঙ্গীত শ্রবণ করিলে, এই কয়েকটি কথা ইহার মধ্যে সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাওয়া যায়—"তিনি আছেন—মানব মণ্ডলীর এই সম্মিলিত স্তব

স্তুতি বায়ু তাঁহারই আদেশে তাঁহার নিকট বহন করিতেছে।”

পরমপবিত্র পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী অতি প্রাচীন স্থান। সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি গৌতম এখানে বসিয়া নির্ব্বাণমুক্তি প্রতিপাদক মত প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌতমের মত প্রচারের পূর্ব্বেও কাশী পবিত্র তীর্থ স্থান বলিয়া ভারতে পরিচিত ছিল।

যখন বৌদ্ধদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইতে লাগিল, তখন আবার প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম কাশীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। পঞ্চ ক্রোশী কাশী যে কেবল ভারতবাসিদিগের নিকট পরিচিত ছিল, তাহা নহে। বার শত বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশীয় বৌদ্ধগণ তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে এখানে আসিয়া অবস্থান করিতেন। তখন অন্যূন ত্রিশটী বৌদ্ধাশ্রম এবং শতাধিক প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের দেবালয় দ্বারা এই পরম পবিত্র স্থান সুশোভিত ছিল। কিন্তু মুসলমানদিগের আক্রমণের পর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কি কাশীর আর সেই পূর্ব্বের অবস্থা আছে? পূর্ব্বের শত শত দেবমন্দির, শত শত বৌদ্ধাশ্রম, দীর্ঘকাল যাবত্ ভূগর্ভে কিম্বা নদীগর্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে।

ধর্ম্মের নামে, সত্যের নামে, এখানে কত শত সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। প্রায় এগার শত বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য কাশী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সকল চিহ্ন লোপ করিয়া, শৈবধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন। সেই সময় হইতেই বরুণার উত্তর পার্শ্বে কাশী সংস্থাপিত হইল, বৌদ্ধাশ্রম সকল দক্ষিণ পার্শ্বে রহিল।

বরুণার উত্তর পার্শ্বস্থিত এই নব কাশীতে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসের প্রারম্ভে, অর্থাৎ বাঙ্গলা আষাঢ় মাসের শেষভাগে, এক দিন প্রাতঃকালে এক জন সম্ভ্রান্তা রমণী প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া অপর তিনটী ভদ্র মহিলার সমভিব্যাহারে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন। প্রাগুক্ত ভদ্রমহিলাত্রয় ভিন্ন, এই সম্ভ্রান্তা রমণীর সঙ্গে আর চারি পাঁচ জন দাসীও ছিল। রাস্তার অন্যান্য লোক ইহাঁদিগকে দেখিলেই, রাস্তার এক পার্শ্বে সরিয়া যাইয়া, সম্ভ্রান্তা রমণীর গমন পথ পরিষ্কার করিয়া দিত। যদি রাস্তার কোন লোক এই রমণীর গমনপথ হইতে সরিয়া না যাইত, তবে তৎক্ষণাৎ রাস্তার অন্যান্য লোক এবং রাস্তার পার্শ্বস্থিত দোকানী পসারীগণ তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিত, “আহাম্মক, চক্ষু নাই? কে যাইতেছে দেখ না? পথ ছাড়িয়া দে।”

এ রমণী প্রত্যহ প্রাতঃকালেই এই প্রকার প্রাগুক্ত ভদ্রমহিলা ত্রয় এবং চারি পাঁচ জন দাসী সমভিব্যাহারে গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতে যাইতেন। সহরে বিশেষ কোন্ গোলযোগ উপস্থিত না হইলে, কোন পুরুষ ইহাঁর সঙ্গে স্নানের সময় গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত যাইত না। গঙ্গার ঘাটে যাইবার সময় রাস্তার সমুদয় লোক এবং রাস্তার পার্শ্বস্থিত দোকানী পসারীগণ ইহাঁকে দেখিবা মাত্রই করযোড়ে প্রণাম করিত। কেহ কেহ কথনও কথনও সম্মুখে আসিয়া ইহাঁর চরণতলে লোটাইয়া পড়িত। ইহাঁর পরিচ্ছদ কাশী এবং প্রয়াগ অঞ্চলের স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদের ন্যায় ছিল। কিন্তু ইহার সঙ্গের অপর তিনটি ভদ্রমহিলার পরিচ্ছদ দেখিলে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই বঙ্গদেশের স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইত।

রমণী এবং তাঁহার সঙ্গিনীগণ মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া সেই সিক্ত বসনেই বরাবর উত্তরদিকে চলিলেন। প্রথমতঃ অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাইয়া, মন্দির দ্বারে প্রণাম পূর্ব্বক সকলে সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে আবার মন্দির দ্বারে প্রণাম করিয়া, মহাদেবের মন্দিরে চলিলেন। মহাদেবের মন্দিরেও এই প্রকার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অন্য এক দেবালয়ে চলিলেন। এইরূপে ক্রমে সমুদয় দেবালয় প্রণাম এবং প্রদক্ষিণান্তে আবার মণিকর্ণিকা ঘাটে আসিয়া, গঙ্গায় ডুব দিয়া উঠিলেন, এবং সিক্ত বসনেই গৃহাভিমুখে চলিলেন।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় কথনও কথনও এই সম্ভ্রান্তা রমণী আপন সঙ্গিনীদিগের সঙ্গে নানা কথা বার্ত্তা বলিতেন। আজ তিনি আপন সঙ্গিনীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনা রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনি কি তবে স্বামী পুত্রের পিণ্ড প্রদানার্থ গয়া যাইবেন বলিয়া নিশ্চয়ই ঠিক করিয়াছেন?—"

প্রাচীনা। মা, আমি কিছুই ঠিক করিতে পারি না। আমার শ্বশুরের কথা কথনও মিথ্যা হয় নাই। তিনি পরম পণ্ডিত এবং বড় ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমার পুত্র বিশ্ববিজয়ী হইবেন, আমার পুত্রবধূ বীরমাতা হইবেন। কিন্তু আজ চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত স্বামী পুত্রের আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছি। তাঁহারা যদি সত্য সত্যই আত্মহত্যা করিয়া থাকেন, তবে গয়ায় পিণ্ড না পড়িলে তো আর তাঁহাদের মুক্তি নাই। আর কতদিন বিলম্ব করিব। জানি না পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম।

আমার শ্বশুরের কথা কখনও মিথ্যা হয় নাই। কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে তাহাও মিথ্যা হইল।

সম্ভ্রান্তা স্ত্রী। আপনি মহাদেবের মন্দির দ্বারে আর একবার ধর্ণা দিয়া দেখুন।

প্রাচীনা। একবার তো ধরণা দিয়াছিলাম। তখন স্বপ্নাবেশে আমার পুত্রকে সিপাহীরবেশে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু স্বামীর আকৃতি দেখিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। রক্ত মাংসশূন্য যেন কয়েকখানা হাড়, দেখিলে মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, প্রেতযোনি বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেই আমার সন্দেহ হয় যে স্বামী হয় তো আত্মহত্যা করিয়া প্রেতযোনিত্ব লাভ করিয়াছেন। এখন গয়ায় পিণ্ড না পড়িলে আর তাঁহার উদ্ধার নাই।

সম্ভ্রান্তা। তোমার জামাতাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইলে না?

প্রাচীনা। মা, তাহাকেও দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সে কথা আমি মুখে আনিতে পারি না।

এই কথা বলিবামাত্রই প্রাচীনার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুনিপতিত হইতে লাগিল। তিনি তখন বাষ্পাকুলকণ্ঠে বলিলেন, "মা, জামাতার মৃত শব গঙ্গার মধ্যে ভাসিতে দেখিলাম।"

প্রাচীনা রমণীকে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া, সেই সম্ভ্রান্তা রমণীরও চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। তিনি তখন ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সকল কথোপকথন পরিত্যাগ করিয়া, অন্য বিষয়ে কথা বলিবার অভিপ্রায় প্রাচীনাকে বলিলেন,—

"আপনি আর দুই মাস বিলম্ব করুন। দুই মাসের মধ্যে যদি স্বামী পুত্রের কোন সংবাদ না পান, তবে পরে গয়ায় যাইবেন। আমি সম্প্রতি চেৎসিংহ এবং সুজনসিংহের মঙ্গল কামনা করিয়া একটী ব্রতাবলম্বন করিয়াছি। এই আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপন কালে চেৎসিংহ সুজনসিংহের নিমিত্ত যেরূপ মঙ্গল কামনা করিব। আপনার পতি পুত্র জামাতার মঙ্গলের নিমিত্ত ও সেই রূপ বর প্রার্থনা করিব। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই ব্রত প্রতিপালন করিতে পারিলে লোক সিদ্ধকাম হয়। আমি শারীরিক নানা কষ্ট সহ্য করিয়া এ ব্রতপালন করিব। আর ব্রত প্রতিষ্ঠাকালে ভগবান্ ভূতভাবন পার্ব্বতীনাথের নিকট যে বর প্রার্থনা করিব, তাহাই তিনি প্রদান করিবেন।"

সম্ভ্রান্ত রমণীর বাক্যাবসানে প্রাচীনা সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন,—"মা, আমরা আপনার ঋণ আর কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। আজ দুই বৎসর যাবত্ আপনি আমাদিগকে অন্ন বস্ত্র প্রদান করিয়া, প্রতিপালন করিতেছেন। আমার চির দুঃখিনী কন্যা এবং পুত্রবধূকে আপনি আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেছেন। আমাকে আপন জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় সম্মান করিতেছেন। আমিতো আপনার দাসীরও উপযুক্ত নহি। আপনি রাজরাণী, আমি ভিখারিণী। আমি আপনার কথা কখনও অমান্য করিব না। বোধ হয় আপনার পুণ্যবলে আমি পতি পুত্র জামাতার মুখ দর্শন করিতে পারিব। পরমেশ্বর আপনাকে কেবল দয়া মায়া দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার সপত্নী পুত্র চৈৎসিংহ ও সুজনসিংহ অন্যের কুপরামর্শ শ্রবণ করিয়া, আপনাকে গৃহ বহিস্কৃতা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনি এখনও অহর্নিশ কেবল তাঁহাদেরই মঙ্গল কামনা করেন। আমার শ্বশুর বলিতেন, যাহার দ্বেষ হিংসা নাই তিনিই দেবতা। আপনার শরীরে কোন দ্বেষ হিংসা নাই, আপনি নিশ্চয়ই দেবতা।—"

পাঠক ও পাঠিকাগণ বোধ হয় এই প্রাচীনা রমণী কে তাহা এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই প্রাচীনা রমণী অমরসিংহের গর্ভধারিণী জগদম্বা দেবী। ইনি এই উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের উল্লিখিত বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী। ইহাঁকে এবং ইহাঁর কন্যা ও পুত্রবধূকে দুর্বৃত্ত মীরণ অসদ্ অভিপ্রায়ে ধৃত করিয়া নিয়াছিল। কিন্তু মীরণের মাতা নবাব মীর জাফরের স্ত্রী ইহাঁদিগকে মীরণের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। পরে ইহাঁরা যেরূপে কাশীতে আসিয়াছেন, তাহা এতত্ পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে। কাশীতে আসিবার পর কয়েক বৎসর ইহাঁরা অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপর বিগত দুই বৎসর যাবত্ মহারাজ বলবন্ত সিংহের প্রধান স্ত্রী মহারাণী গোলাপ কুমারী আপন গৃহে ইহাঁদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। যে সম্ভ্রান্তা রমণীর সমভিব্যাহারে ইহাঁরা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন তিনিই মহারাণী গোলাপকুমারী। বলবন্ত সিংহের মৃত্যুর বৎসরেক পরেই রাণী গোলাপ কুমারী রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীতে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইহাঁর বদান্যতা নিবন্ধন কাশীবাসী দীন দরিদ্রদিগের এখন আর বড় অন্ন কষ্ট হয় না।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মহারাণী গোলাপকুমারী।

ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের করতলস্থ হইলে পরও বারাণসী বরাবরই হিন্দু রাজগণের শাসনাধীনে ছিল। বারাণসী কিম্বা কাশী হিন্দুদিগের একটী পরম পবিত্র তীর্থস্থান। এই স্থানে যবনদিগের শাসন প্রণালী কিম্বা যাবনিক আচার ব্যবহার কোন প্রকারে প্রবর্ত্তিত না হয়, তজ্জন্য হিন্দুগণ সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। কখনও কোন কোন দিল্লীর বাদসাহ বারাণসীতে মুসলমান সুবাদার নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেই বারাণসী জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়া উঠিত—কাশীবাসী পণ্ডিতগণ, ধর্ম্মার্থিগণ, ও ব্যবসায়িগণ কাশী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেন। সুতরাং দিল্লীর বাদসাহগণ বারাণসী বরাবরই জনৈক করপ্রদ হিন্দুরাজার শাসনাধীনে রাখিয়া দিতেন। আরঙ্গীব দিল্লীর সম্রাট হইলে পর, তিনি কাশীর সমুদয় হিন্দু দেবালয় ভগ্ন করিয়া মস্‌জিদ নির্ম্মাণের আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুদেবালয় ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিবামাত্র, কাশী জনশূন্য হইয়া পড়িল। তখন তিনিও বুঝিতে পারিলেন যে বারাণসী হিন্দুরাজার শাসনাধীনে না রাখিলে, এই প্রাচীন সহর একেবারেই জনশূন্য হইয়া পড়িবে, সুতরাং তাঁহাকেও স্বীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল।

নাদের সাহার ভারত আক্রমণ পর্য্যন্ত কাশীর রাজা দিল্লীর বাদসাহকে বৎসর বৎসর কিঞ্চিৎ কর প্রদান পূর্ব্বক রাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু নাদের সাহার ভারত আক্রমণের পর দিল্লীর বাদসাহের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব একেবারে হ্রাস হইল। তখন অযোধ্যার উজীর সুযোগ পাইয়া বারাণসী স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিলেন। এই সময় হইতে বারাণসীর রাজা অযোধ্যার উজীরের অধীনে করপ্রদ রাজা হইয়া পড়িলেন। রাজা মানসরাম সিংহের সময়ই বারাণসী অযোধ্যার উজীরের অধীন হইল।

১৭৪০ খৃঃ অব্দে মানসরাম সিংহের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পুত্র বলবন্ত সিংহ কাশীর রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। বলবন্তসিংহের সহধর্ম্মিণীর নামই মহারাণী গোলাপকুমারী। শান্ত প্রকৃতি, সুশীলা, পরমসাধ্বী গোলাপ

কুমারী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের প্রভাবেই বলবন্ত সিংহ তৎকাল প্রচলিত বিবিধ পাপ ও কুকার্য্য হইতে বিরত থাকিতেন।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের হিন্দুরাজগণও মুসলমান নবাবদিগের ন্যায় বহু বিবাহ করিতেন। ইঁহারাও শত শত কুলকামিনীকে উপপত্নী স্বরূপ অন্দরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কিন্তু পতিপ্রাণা গোলাপ কুমারী স্বীয় পতি বলবন্ত সিংহকে এই সকল কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিতে কৃতকার্য্যা হইলেন।

বলবন্ত সিংহ একমাত্র গোলাপ কুমারীর প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার আর দ্বিতীয় পত্নী ছিল না। আর তিনি কখনও কোন উপপত্নীও রাখিতেন না।

কিন্তু সমাজ প্রচলিত পাপ, দুর্নীতি এবং ঘৃণিত আচার ব্যবহার অস্পষ্টরূপে এবং অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক নরনারীর হৃদয় মন কলুষিত করে। সিদ্ধপুরুষ না হইলে, সমাজ প্রচলিত পাপের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। সমাজের মধ্যে যে সকল পাপ ও কুপ্রথা প্রচলিত থাকে, তাহা লোকের নিকট পাপ কিম্বা কুপ্রথা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বরং সেই সকল পাপ এবং কুপ্রথা যাহারা সমর্থন করেন, তাহারা কখনও কখনও দেশহিতৈষী বলিয়া সমাজের মধ্যে পরিগণিত হয়েন।

ভারতবর্ষের রাজা এবং নবাবদিগের মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে একটি ঘৃণিত প্রথা প্রচলিত আছে। রাজা এবং নবাবদিগের দরবারে বৃত্তিভোগিনী অসংখ্য অসংখ্য গায়িকা, এবং নর্ত্তকী থাকে। এই সকল কুচরিত্রা রমণী রাজা কিম্বা নবাব দরবারের একটী অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। দিনান্তে সায়ংকালে যখন মানুষের হৃদয় স্বতঃই ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়; দিবা রাত্রের মধ্যে যে সময়টী ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার বিশেষ উপযোগী, ভারতবর্ষের রাজা এবং নবাবগণ দেশ প্রচলিত কুপ্রথানুসারে সেই সায়ংকালেই প্রাগুক্ত বৃত্তিভোগিনী গায়িকা এবং নর্ত্তকী লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে বসেন। কোন কোন রাজা কিম্বা নবাব সর্ব্বদাই ইহাদিগের কুসংসর্গে কাল যাপন করেন; রাজকার্য্যে কখনও মন নিবেশ করেন না।

রাজা বলবন্ত সিংহের দরবারেও এইরূপ গায়িকা এবং নর্ত্তকী ছিল। তাঁহাকেও প্রায় প্রত্যেক দিন সায়ংকালে এই সকল কুচরিত্রা রমণীদিগের সংসর্গে কাল যাপন করিতে হইত। তিনি সর্ব্বদাই ইহাদিগের গীত

বাদ্য শ্রবণ করিতেন। কিন্তু অন্যান্য রাজাগণের ন্যায় তিনি কামাসক্ত ছিলেন না। সুতরাং ইহাদের মধ্যের কেহ তাঁহার উপপত্নী ছিল না।

রাজগণের মধ্যে এইরূপ গায়িকা ও নর্ত্তকী রাখিবার প্রথা প্রচলিত থাকিলেও শুদ্ধচিত্তা গোলাপ কুমারীর নিকট বলবন্ত সিংহের এই আচরণ অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি বলবন্ত সিংহকে সর্ব্বদাই ইহাদিগের গীত বাদ্য শ্রবণ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গীত বাদ্যের প্রতি বলবন্ত সিংহের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। গোপাল কুমারী বুঝিতে পারিলেন যে, অন্দরের মধ্যে বলবলন্ত সিংহের মনোরঞ্জনার্থ গীত বাদ্যের আয়োজন করিতে না পারিলে, এই কুকার্য্য হইতে তাঁহাকে বিরত রাখিতে সমর্থা হইবেন না। গোলাপ কুমারী তখন মনে মনে স্থির করিলেন, যে, ভদ্রবংশ-জাতা দশ কি বার বৎসরের একটি কন্যা আনাইয়া, তাহাকে গীত বাদ্য শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিবেন। সে গীত বাদ্য এবং নৃত্য শিক্ষা করিয়া, অনায়াসে অন্দরের মধ্যে তাঁহার নিজের প্রকোষ্ঠে বসিয়া, তাঁহার স্বামীর মনোরঞ্জনার্থ গান বাদ্য করিতে পারিবে। এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে, তাঁহার স্বামীকে আর কুচরিত্রা স্ত্রীলোকদিগের সংসর্গে সময়াতিপাত করিতে হইবে না।

মনে মনে এই প্রকার স্থির করিয়া, গোলাপ কুমারী আপন পরিচারিকা-দিগকে ভদ্রবংশজাতা দশ বার বৎসরের একটী বালিকার অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। তাঁহার পরিচারিকাগণের মধ্যে একটা অতি জঘন্য চরিত্রের স্ত্রীলোক ছিল। সে অধিক পুরস্কার লাভ করিবার আশায় আপন উপপতির সাহায্যে কাশীবাসী এক জন পরমধার্ম্মিক মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতের দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে গোপনে অপহরণ করিয়া আনিয়া দিল। কন্যাটী অত্যন্ত পিতৃবৎসলা ছিল। পিতা ভিন্ন সে আর কিছুই জানিত না। পিতাই তাহার প্রাণ, পিতাই তাহার সর্ব্বস্ব ছিল। সুতরাং গোলাপ কুমারীর নিকট তাহাকে আনিবামাত্র সে আপন পিতার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। গোলাপ কুমারী তাহার প্রমুখাৎ শুনিতে পাইলেন যে, তাহার পিতার অগোচরে তাহাকে বল পূর্ব্বক ধৃত করিয়া আনিয়াছে। তাহার পিতার নাম শ্রীনিবাস পণ্ডিত।

কোন ভদ্রবংশজাতা কন্যাকে তাহার পিতা মাতার অসম্মতিতে বল পূর্ব্বক ধৃত করিয়া আনিতে গোলাপ কুমারী কখন আদেশ করেন নাই।

সুতরাং তাঁহার পরিচারিকা এইরূপ কুকার্য্য করিয়াছিল বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে গৃহ বহিষ্কৃতা করিয়া দিলেন। কন্যাটীকে তাঁহার পিতার হস্তে প্রত্য-র্পণ করিবেন বলিয়া শ্রীনিবাস পণ্ডিতের অনুসন্ধানে কাশীর স্থানে স্থানে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দুই মাস যাবত্ অনুসন্ধান করিয়াও তাহার প্রেরিত লোকেরা শ্রীনিবাস পণ্ডিতকে কোথাও পাইল না। কন্যা অপহৃত হইলে পর শ্রীনিবাস পণ্ডিত শোকে উন্মত্ত হইয়া, কন্যার অনু-সন্ধানে বঙ্গ দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালী যাত্রিকগণ তাঁহার কন্যাকে চুরি করিয়াছে বলিয়া, তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল।

এ দিকে কন্যাটীকে গোলাপ কুমারী মাতার ন্যায় সস্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। দুই মাসের মধ্যেও যখন ইহার পিতার কোন অনু-সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন গোলাপ কুমারী মনে করিলেন, যে, হয় তো ইহার পিতা ইহাকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ গোলাপ কুমারীর পরিচারিকাও গোলাপ কুমারীর নিকট তাহাই বলিয়াছিল।

দুই মাস পরে গোলাপ কুমারী এই কন্যাটীর গীত বাদ্য শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিলেন। গীত বাদ্যে লোকের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। সঙ্গীতের আসক্তির ন্যায় আর প্রবল আসক্তি দেখা যায় না। বালিকাটী গীত বাদ্যে এতদূর আসক্ত হইল যে, সে অত্যল্প কাল মধ্যেই আপন পিতাকে বিস্মৃত হইল; এবং বিশেষ সুখ স্বচ্ছন্দতা সহকারে বলবন্ত সিংহের অন্দরে বাস করিতে লাগিল।

প্রায় প্রত্যহই গোলাপ কুমারীর শয়ন প্রকোষ্ঠে বসিয়া এই বালিকা বলবন্ত সিংহের মনোরঞ্জনার্থ গীত বাদ্য করিত। এখন আর বলবন্ত সিংহকে বৃত্তিভোগিনী গায়িকা নর্ত্তকীদিগের সংসর্গে সময়াতিবাহন করিতে হইত না। এইরূপে এক ক্রমে চারি বৎসর গত হইলে পর বালিকার পূর্ণ যৌবন কাল উপস্থিত হইল। গোলাপ কুমারী ইহাকে কোন ভদ্র সন্তানের সঙ্গে বিবাহ দিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন।

এই বালিকাটীর নাম পূর্ণিমা * ছিল। পূর্ণিমার মুখখানি ঠিক পূর্ণি-মার চন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্ল। চন্দ্রাননা পূর্ণিমার পূর্ণ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তাহার রূপ লাবণ্য দর্শনে পুরুষের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকদিগের পর্য্যন্ত

* ইংরাজি ইতিহাসে বোধ হয় পূর্ণিমা শব্দই "পানা" "পুনা" কিম্বা "পোনা" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

মন মোহিত হইত। বলবন্ত সিংহ পূর্ণিমার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলেন। পূর্ণিমার দিকে তাঁহার মন দিন দিন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। গোলাপ কুমারী পূর্ণিমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেই বলবন্ত সিংহের মুখ বিষণ্ণ হইত। অবশেষে আর তিনি আপন মনের ভাব গোপন রাখিতে সমর্থ হইলেন না। পূর্ণিমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত গোলাপ কুমারীর অনুমতি চাহিলেন।

পতি প্রাণা গোলাপ কুমারী বলিলেন—"নাথ, একমাত্র তোমাকে সুখী করিবার নিমিত্ত আমি জীবন ধারণ করিতেছি। এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও যদি তোমাকে সুখী করিতে পারি, তবে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও আমি কুণ্ঠিত নহি। আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। পূর্ণিমাকে বিবাহ করিলে যদি তোমার সুখ শান্তি বৃদ্ধি হয়, তবে তুমি তাহাকে ধর্ম্ম পত্নী স্বরূপ গ্রহণ কর। আমি পিতৃ ক্রোড় হইতে এই বালিকাকে বিছিন্ন করিয়া আনিয়াছি, সে পাপের ফল আমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। এখন যদি তুমি ইহাকে ধর্ম্মপত্নীস্বরূপ গ্রহণ না করিয়া উপপত্নী কর, তবে তাহাতে আমার আরও অধিক পাপ হইবে। আজ হইতে আমি পূর্ণিমাকে পতি দান করিলাম। আমি আর তোমার শয্যাভাগিনী হইব না। পূর্ণিমাকে বিবাহ করিতে আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি।"

এই কথা বলিয়াই গোলাপ কুমারী স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বলবন্ত সিংহ সেই দিনই পূর্ণিমাকে বিবাহ করিলেন*।

পূর্ণিমার গর্ভে বলবন্ত সিংহের ক্রমে দুইটী পুত্র জন্মিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম চৈৎ সিংহ ও কনিষ্ঠের নাম সুজন সিংহ রাখিলেন। গোলাপ কুমারীর গর্ভজাত কোন পুত্র সন্তান ছিলনা। তাঁহার একটী মাত্র কন্যা ছিল। বলবন্ত সিংহ জীবিত থাকিতেই সেই কন্যাকে দুর্ব্বিজয় সিংহের সঙ্গে বিবাহ দিলেন।

গোলাপ কুমারী সপত্নী পুত্র চৈৎ সিংহ এবং সুজন সিংহকে আপন সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পূর্ণিমার সন্তানাদি প্রতি-

---

* ইংরাজ ইতিহাস লেখক পূর্ণিমাকে (Ponnah) বলবন্ত সিংহের উপপত্নী বলিয়াছেন। কিন্তু মার্কহ্যাম সাহেবের পত্র পাঠ করিলে এ সংস্কার দূর হইবে।

পালনের আর অবকাশ হইত না। তিনি সর্ব্বদাই গীত বাদ্য নৃত্য ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকিতেন।

চৈৎসিংহ এবং সুজনসিংহের জন্মের পাঁচ ছয় বৎসর পরে, রাজা বলবন্ত সিংহ দিল্লীর বাদসাহ এবং অযোধ্যার উজীর সুজাউদ্দৌলার সমভিব্যাহারে মীরকাসিমের সাহায্যার্থ সসৈন্যে বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বক্‌সারের যুদ্ধে মীরকাসিম পরাজিত হইলে পর, দিল্লীর বাদসাহ সাহআলাম এবং রাজা বলবন্ত সিংহ সুজাউদ্দৌলাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংরেজদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। ইহারা ইংরেজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গে আসিয়া ছিলেন। কিন্তু এখন ইংরেজদিগের চক্রান্তে পড়িয়া ইহারা প্রতারিত হইলেন; এবং সুজাউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে ইংরেজদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

সুজাউদ্দৌলা অনন্যোপায় হইয়া পড়িলেন। তিনি মীরকাসিমকে সঙ্গে করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে ইংরেজ সৈন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল।

ইংরাজেরা সুজাউদ্দৌলার সমুদয় রাজ্য দিল্লীর বাদসাহকে প্রদান করিবেন বলিয়া তাঁহাকে আশা প্রদান করিলেন। দিল্লীর বাদসাহও বারাণসী এবং গাজিপুর ইংরেজদিগকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। এ পর্য্যন্ত বলবন্ত সিংহ সুজাউদ্দৌলাকে কর প্রদান পূর্ব্বক বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবানুসারে বলবন্ত সিংহের দেয় কর ইংরাজেরা পাইবেন বলিয়া অবধারিত হইল। বলবন্ত সিংহ ইংরাজদিগের অধীনে করপ্রদ রাজা হইবেন বলিয়া সুস্থির হইল।

এই সকল প্রস্তাব বিলাতে পৌঁছিলে, কোর্ট অব ডিরেক্টর এ সমুদয়ই অগ্রাহ্য করিলেন। সুতরাং সুজাউদ্দৌলাকে আর রাজ্যচ্যুত করা হইল না। বলবন্ত সিংহের রাজ্য পূর্ব্বে যেরূপ সুজাউদ্দৌলার অধীনে ছিল এখনও সেই অবস্থায়ই রহিল।

ইংরেজরা বলবন্ত সিংহের সঙ্গে মিত্রতা সংস্থাপন করিলেন। বলবন্ত সিংহের রাজ্যকে মিত্র রাজ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান সময় কাবুলের আমীরের সঙ্গে ইংরেজদিগের যেরূপ সম্বন্ধ, বক্‌সারের যুদ্ধের পর বলবন্ত সিংহের সঙ্গে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল। ইংরাজ রাজ্যের পশ্চিম সীমা কর্ম্মনাশা নদী। কর্ম্মনাশার

পশ্চিম পার বলবন্ত সিংহের রাজ্যের অন্তর্গত। সুতরাং পশ্চিম হইতে ইংরাজ রাজ্য কেহ আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলে, বলবন্ত সিংহের রাজ্যের মধ্য দিয়া তাহাকে আসিতে হয়। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী এই জন্য বলবন্ত সিংহের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষার্থ সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অন্যান্য সমুদয় শত্রুর আক্রমণ হইতে বলবন্ত সিংহের রাজ্য রক্ষা করিবেন বলিয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিশ্রুত হইলেন।

১৭৭০ সনে বলবন্ত সিংহের মৃত্যু হইল। তিনি মৃত্যুকালে সমুদয় রাজ্য ভার জ্যেষ্ঠা স্ত্রী গোলাপকুমারীর হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর উজীর সুজাউদ্দৌলা তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগকে রাজ্যচ্যুত করিতে উদ্যত হইলে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী আত্মরক্ষার্থ সুজাউদ্দৌলাকে এই দুরভিসন্ধি হইতে বিরত রাখিলেন। ইহার পর ১৭৭৩ সালে যখন হেষ্টিংসের সঙ্গে সুজাউদ্দৌলার বারাণসীতে সাক্ষাৎ হইল, তখন আবার সুজাউদ্দৌলা বারাণসী একেবারে আপন শাসনাধীনে আনিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু হেষ্টিংসের আশঙ্কা হইল যে, সুজাউদ্দৌলার রাজ্য বিস্তার হইলে উত্তর কালে সে ইংরাজদিগকে দেশ বহিষ্কৃত করিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং বারাণসী সন্ধির সময়ও বলবন্ত সিংহের রাজ্য পূর্ব্বাবস্থায়ই রহিল।

রাজ্য বিনাশের মূল কারণ প্রায়ই গৃহবিচ্ছেদ। গৃহ বিচ্ছেদ না হইলে সহজে রাজ্য নষ্ট হয় না। বলবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর গোলাপকুমারী বিশেষ কার্য্যদক্ষতা সহকারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেকানেক অসচ্চরিত্র কর্ম্মচারিগণ গৃহ বিচ্ছেদ ঘটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। চৈৎসিংহ এবং সুজনসিংহ নাবালক ছিলেন। তাঁহারা তখন রাজকার্য্য কিছুই বুঝিতেন না। দুই চারি জন অসচ্চরিত্র কর্ম্মচারী মনে করিলেন যে, গোলাপকুমারীকে চৈৎসিংহের দ্বারা গৃহ বহিষ্কৃতা করাইয়া দিলে অনায়াসেই রাজ সংসার লুণ্ঠন করিতে পারিবেন।

এই সকল বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী ক্রমাগত চৈৎসিংহ সুজনসিংহ এবং পূর্ণিমার নিকট বলিতে লাগিল, যে, গোলাপকুমারী সত্বরই এই রাজ্য আপন গর্ভজাত কন্যাকে প্রদান করিবেন; গোলাপকুমারীর হাতে রাজ কার্য্যের ভার থাকিলে, চৈৎসিংহ এবং সুজনসিংহের রাজ্যলাভের আশা নাই।

পূর্ণিমা বাল্যাবস্থা হইতে কেবল গীত বাদ্যই শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য কার্য্য কিম্বা অন্য বিষয় সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।

চৈৎসিংহ সুজনসিংহ এখনও বালক। সুতরাং সহজেই তাঁহারা কর্ম্মচারিদিগের কুমন্ত্রণায় প্রতারিত হইলেন; এবং গোলাপকুমারীকে গৃহ বহিষ্কৃতা করিয়া দিবার চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। সহৃদয়া গোলাপকুমারী ইহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, এক দিন পূর্ণিমাকে আপন প্রকোষ্ঠে ডাকাইয়া আনিয়া, বলিতে লাগিলেন যে, রাজপদ এবং রাজ্য অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। রাজপদ অপেক্ষা অসংখ্যগুণে মূল্যবান যে রত্ন—যে রত্ন নারীর অদেয়,—নারী প্রাণ থাকিতে যে রত্ন দান করিতে পারে না,—সেই অমূল্য নিধিই তিনি তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। এখন কি তিনি অধর্ম্মাচরণ করিয়া চৈৎসিংহকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন? চৈৎসিংহ রাজ্য রক্ষণে অসমর্থ বলিয়াই তিনি রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু গোলাপকুমারীর এই সকল কথায় পূর্ণিমার বিশ্বাস হইল না। তিনি আপন পুত্রদ্বয় এবং কর্ম্মচারিদিগের সঙ্গে গোলাপকুমারীকে গৃহ বহিষ্কৃতা করিয়া দিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের আচরণ দৃষ্টে গোলাপকুমারীর মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি অত্যন্ত ত্যক্ত হইয়া রাজকার্য্য সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীতে চলিয়া গেলেন। চৈৎসিংহ স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। গোলাপকুমারী আজ প্রায় দুই বৎসর যাবত্ কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। এখনও তিনি সর্ব্বদা চৈৎসিংহ এবং সুজনসিংহের মঙ্গল কামনা করেন।

গোলাপকুমারী কাশীতে আসিবার দুই তিন দিন পরে, স্নানোপলক্ষে গঙ্গার ঘাটে যাইয়া দেখেন, তিনটী স্ত্রীলোক অনাহারে মৃত প্রায় হইয়া ঘাটে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদিগকে এইরূপ দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া, আপন বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। পরে ইহাদিগের সমুদয় দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া, আপন গৃহে ইহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

এই তিনটী স্ত্রীলোকের মধ্যে বৃদ্ধা রমণীর নাম জগদম্বাদেবী। ইনি বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী, অমরসিংহের গর্ভধারিণী। দ্বিতীয়ার নাম তিলোত্তমা, ইনি অমরসিংহের ভগ্নী। আর তৃতীয়া স্ত্রীলোকটীর নাম সুরুচি। ইহাঁর বয়স এখন প্রায় পঁচিশবৎসর হইয়াছে। ইনি অমরসিংহের স্ত্রী।

ইহারা তিন জন এই দুই বৎসর যাবৎ গোলাপকুমারীর গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তিলোত্তমা এবং সুরুচিকে গোলাপকুমারী আপন কন্যার

ন্যায় স্নেহ করেন। জগদম্বাকে তিনি জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় সম্মান করেন। প্রায় চৌদ্দবৎসর হইল জগদম্বা স্বামী পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। স্বামী পুত্র এবং জামাতার সহিত তাঁহার যে আর সাক্ষাৎ হইবে, সে আশা এখন দিন দিনই হ্রাস হইতেছে। ইতি পূর্ব্বে স্বামী পুত্র জামাতার পিণ্ড প্রদানার্থ গয়া যাইবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু গোলাপ কুমারীর অনুরোধে যে, সে দিন গয়া যাইবার সঙ্কল্প দুই মাসের নিমিত্ত স্থগিত রাখিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মাতৃচরণ দর্শন।

প্রয়াগ হইতে শত শত পথিক কাশীতে যাইতেছে। পূর্ব্বে পথিকেরা রাত্রে গমনাগমন করিতেও ভয় করিত না। কিন্তু এখন দেশব্যাপ্ত অরাজকতা নিবন্ধন রাত্রে লোক বড় যাতায়াত করে না। চোর ডাকাতের ভয় অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। দেশের সমুদয় লোক অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা পূর্ব্বে সাধু লোক বলিয়া পরিচিত ছিল; তাহারাও এখন চোর ডাকাতের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। ক্রমাবচ্ছিন্ন দেশের অর্থ শোষন হইতে থাকিলে এইরূপ অবস্থাই সমুপস্থিত হয়।

কাশী হইতে পশ্চিমে তিন চারি ক্রোশ দূরস্থিত একটী বাজারে সায়ংকালে চারিটি পথিক আসিয়া রাত্রে বিশ্রাম করিতে ছিল। ইহাদের মধ্যে তিনটি পুরুষ, একটি মাত্র স্ত্রীলোক। রাত্র প্রহরেক থাকিতে ইহাদের মধ্যে একজন জাগ্রত হইয়া, অপর তিন জনকে বলিতেছে, "তোমরা এখন শীঘ্র শীঘ্র উঠ। এখন রওনা হইলে অতি প্রত্যুষে কাশীতে পৌছিতে পারিব। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র কাশীতে পৌছিতে না পারিলে, আজ সমুদয় দিনই নষ্ট হইবে।"

অপর তিন জনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ পুরুষ বলিয়া উঠিল, "এত রাত্রি থাকিতে কোথায় যাইব? ঠিক প্রত্যুষে পৌছিতে না পারি, দুই দণ্ড বেলা হইলে তো পৌছিতে পারিব?"

প্রথম ব্যক্তি। ঠিক প্রত্যূষে পৌঁছিতে না পারিলে, আজ কোন কাজই হইবে না। সমুদয় দিবসই আমাদের বৃথা যাইবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কেন বৃথা যাইবে?

প্রথম ব্যক্তি। মা কাশীতে কোন স্থানে কি ভাবে আছেন, তাহাতো কিছুই জানি না। তল্লাস করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করা দুঃসাধ্য। এত বড় সহর হইতে কি অপরিচিত লোক খুজিয়া বাহির করা যায়? কিন্তু তিনি কাশীতে থাকিলে, প্রাতঃকালে একবার নিশ্চয়ই দেবালয়ে প্রণাম করিতে আসিবেন। আমি প্রাতঃকালে কাশীতে পৌঁছিয়াই মহাদেবের মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিব। যে সকল স্ত্রীলোক ঠাকুর দর্শন করিতে মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, একে একে তাঁহাদের সকলকেই দেখিতে পাইব। এই উপায় ভিন্ন মাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার আর কোন উপায় নাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তুমি রাত্রে কেবল এই বিষয়ই চিন্তা করিতেছিলে নাকি?

প্রথম ব্যক্তি। ভাই সমস্ত রাত্রের মধ্যেও আমার নিদ্রা হয় নাই। কেবল আজ কেন? লক্ষ্ণৌ হইতে রওনা হইবার পর চক্ষে আর নিদ্রা নাই। কেবল আশঙ্কা হইতেছে যে, যদি মা কাশী পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে সকল পরিশ্রম বৃথা হইবে। এজীবনে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। যতই কাশীর নিকটে আসিতেছি, ততই আমার এই আশঙ্কা বৃদ্ধি হইতেছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তবে এখনই চল। মহাবীরকে আমাদের বিছানা পত্র বান্ধিতে বল। আমি একবার গাঁজার আয়োজন করি; নহিলে রাত্রে হাঁটিতে পারিব না।

এই চারিটী লোকের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি পাঠকগণের পূর্ব্ব পরিচিত অমর সিংহ। দ্বিতীয় ব্যক্তি বৃদ্ধ ছত্র সিংহ। ইহারা লক্ষ্ণৌ হইতে রওনা হইয়া, প্রথমতঃ প্রয়াগে আসিয়া পৌঁছিল। প্রয়াগ হইতে চাঁদ কুমারী এবং তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে চলিয়াছে। পূর্ব্ব দিবস সায়ংকালে এই বাজারে পৌঁছিয়াছে। এখন প্রহরেক রাত্র থাকিতেই এই স্থান হইতে রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছে।

মহাবীর সমুদয় বিছানা পত্র বাঁধিয়া মস্তকে লইল। অমর সিংহ কতক বিছানা পত্র নিজে বহন করিবে বলিয়া তাহার নিকট চাহিল। কিন্তু সে

বীর বালক বলিল, "এমন সাতটা মোট মাথায় করিয়া, আমি পঞ্চাশ ক্রোশ চলিয়া যাইতে পারি।"

বালকের বীরত্বের কথা শুনিয়া অমর সিংহ চাঁদ কুমারীর দিকে চাহিয়া বলিল, "এমন তেজস্বী বালককে তুমি সাংগ্রামিক জীবন হইতে বঞ্চিত রাখিবার ইচ্ছা করিয়া ছিলে?"

প্রহরেক রাত্র থাকিতে ইহারা রওনা হইয়া, প্রভাতে কাশীতে আসিয়া পৌছিল। অমর সিংহ আপন সঙ্গী ছত্র সিংহ, মহাবীর সিংহ এবং চাঁদ কুমারীকে একটী বৃক্ষতলে বসাইয়া রাখিয়া, নিজে মহাদেবের মন্দিরের দিকে চলিল। প্রভাতে কাশীতে অনেক ষাঁড় ছুটিতে থাকে। কাশীতে বড় ষাঁড়ের ভয়। একটী স্ত্রীলোকের দিকে একটা ষাঁড় ধাবিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী প্রাণের ভয় চীৎকার করিতেছে। অন্যান্য লোক স্ত্রীলোকটীকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া, আপন আপন প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিতেছে। কিন্তু মহাবীর স্ত্রীলোকটীর চীৎকার শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া অকুতোভয়ে ষাঁড়ের শৃঙ্গ ধরিয়া বসিল। চতুর্দ্দিকস্থ লোক ইহার সাহস দর্শনে আশ্চর্য্য হইল। স্ত্রীলোকটী ইহাকে অশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে গেল।

এদিকে অমর সিংহ মহাদেবের মন্দির দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শত শত স্ত্রী পুরুষ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতেছে। সে সতৃষ্ণ নয়নে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাহিতেছে। তাহার হৃদয়ের সে চির অধিষ্ঠাত্রী স্নেহময়ী জননীর প্রতিমূর্ত্তি আর দেখিতে পায় না। তাহার হৃদয় মন কাঁপিয়া উঠিল; ভাবিতে লাগিল, হয়তো জননী কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। অমরসিংহ ক্রমে নিরাশ হইতে লাগিল। ক্রমে সে চেতনা শূন্য হইয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত কাল নয়ন মুদ্রিত করিয়া বলিল, "হে দেবাদিদেব মহাদেব ভূতভাবন কৈলাশপতি, এ চিরদুঃখীর দুঃখ বিমোচন কর; আর এ দুঃখের জীবন ধারণ করিতে পারি না।"

এই বলিয়া অমরসিংহ ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। সহসা দেখে যে হাফেজনন্দিনী স্বর্ণ বিনির্ম্মিত রথে স্বর্গ হইতে তাহার নিকটে আসিতেছেন। রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাহার হাত ধরিয়া উঠাইতেছেন। মৃদু হাস্য প্রস্ফুটিত বদনে বলিতেছেন, "ভয় নাই। একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ।" অমরসিংহ পশ্চাতে চাহিয়া দেখে যে একজন অতি

সম্ভ্রান্তা রমণী ধীরে মন্দিরের দিকে আসিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে পাঁচ ছয় জন স্ত্রীলোক। সে চেতনা লাভ করিয়া আর হাফেজনন্দিনীকে দেখিতে পাইল না। হাফেজনন্দিনী অদৃশ্য হইলেন। অমরসিংহ ভাবিতে লাগিল একি আশ্চর্য্য! আবার সেই সম্ভ্রান্তা রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিছুই ঠিক করিতে পারে না। ক্রমে সম্ভ্রান্তা রমণী মন্দিরের দ্বারে আসিয়া পোঁছিলেন। সম্ভ্রান্তা রমণীর পশ্চাতে যে কয়েকজন স্ত্রীলোক ছিল, তন্মধ্যে তিন জনের পরিচ্ছদ বাঙ্গালী রমণীর পরিচ্ছদের ন্যায়। কিন্তু তাহারা তিন জনই সম্ভ্রান্তা রমণীর পশ্চাতে ছিল। অমরসিংহ এখন পর্য্যন্তও তাহাদের কাহারও মুখ দেখিতে পায় নাই।

এই নবাগত স্ত্রীলোকগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া, মন্দির দ্বারে প্রণাম করিল। ইহাদিগের মধ্যে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় কর-যোড়ে সজল নয়নে বলিতে লাগিল, "ভগবন্, এ দুঃখিনীকে একবার দয়াকর। স্বামীপুত্র জামাতা শোক আর সহ্য হয় না। আমার ভুবনে-শ্বরকে আমার ক্রোড়ে আনিয়া দাও।"

"ভুবনেশ্বর" এই শব্দ অমর সিংহের কর্ণে প্রবেশ করিলে সে সম্মুখে এক পদ অগ্রসর হইবামাত্র দেখে যে, তাহার জননী করযোড়ে মহাদেবের মন্দির দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু নিপতিত হইতেছে। অমর সিংহ আর এক পদ অগ্রসর হইয়াই আত্ম বিস্মৃতের ন্যায় জননীর চরণতলে লোটাইয়া পড়িয়া বলিল, "মা, এই তোমার হতভাগ্য ভুবনেশ্বর।"

রাণী গোলাপকুমারী এবং তাঁহার সঙ্গিনী অন্যান্য স্ত্রীলোক সকলেই একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী এখন পর্য্যন্তও অমরসিংহের মুখ দেখিতে পায়েন নাই। সৈনিক পরিচ্ছদ ধারী এক জন পুরুষ তাঁহার পদতলে পড়িয়া রহিয়াছে। সে এখন সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। রাণী গোলাপকুমারীকে চমকিয়া উঠিতে দেখিয়া, নিকটে দণ্ডায়মান অন্য একটী পুরুষ ভূতলশায়ী অমরসিংহকে ধরিয়া উঠাইল। তাহার জননীর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়িবামাত্র বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী "এই যে আমার বাছা" এই বলিয়া পুত্রের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। মুহূর্ত্তেক পরে অমরসিংহেরও চেতনা হইল। সে সম্মুখে আপন জননী ভগ্নী এবং স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া আনন্দাশ্রুতে ভাসিতে লাগিল।

জগদম্বাদেবী এবং তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূর হৃদয়ের বর্ত্তমান অবস্থা কে ভাষা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে? সে বিষয় বর্ণনা করিবার চেষ্টা বৃথা। সহৃদয় পাঠক অনায়াসে তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা কল্পনা করিতে সমর্থ হইবেন।

আজ বৃদ্ধা জননী পুত্রের গলা ধরিয়া, মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। একত্রে আবার পুত্রের সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করিলেন।

অমরসিংহ জননীর সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় দেবালয় প্রদক্ষিণ করিয়া, একত্রে গঙ্গার ঘাটে আসিল। পরে রাণী গোলাপকুমারীর এক জন ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া ছত্রসিংহ এবং চাঁদকুমারীর নিকট চলিল। তাহারা এতক্ষণ অমরসিংহের অপেক্ষা করিতেছিল। অমরসিংহ তাহাদিগের নিকটে সমুদয় বিবরণ বিবৃত করিল। তাহারা সকলেই যারপরনাই আনন্দ লাভ করিল এবং অমরসিংহের সঙ্গে একত্রে রাণী গোলাপকুমারীর গৃহাভিমুখে চলিল।

অমরসিংহের ভগ্নীপতির মৃত্যু সম্বন্ধে এখন আর তাহার ভগ্নীর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া গয়ায় যাইয়া স্বামীর পিণ্ড প্রদান করিলেন। অমরসিংহের জননী চাঁদকুমারীকেও আপন গর্ভজাত কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার শ্বশুরের কোন কথাই নিষ্ফল হইবে না। কিন্তু এই সুখ দুঃখ পরিপূর্ণ সংসারে কাহারও বিশুদ্ধ সুখ হয় না। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী পুত্রমুখ দর্শনে যার পর নাই আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু আবার জামাতার শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। রাণী গোলাপকুমারী সর্ব্বদাই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেন।

চাঁদকুমারী, তাঁহার পুত্র মহাবীর এবং ছত্রসিংহও রাণী গোলাপ কুমারীর বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের আগমনে গোলাপ কুমারীর একটি নূতন পরিবার গঠিত হইল। তিনি সকলকে সন্তানের ন্যায় মনে করিতেন। ইহারাও সকলে তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কেহ কখনও তাঁহাকে মা না বলিয়া, মহারাণী বলিলে, তিনি একটু অসন্তুষ্ট হইতেন।

কয়েক দিন পরে অমরসিংহ তাহার পিতার অনুসন্ধানে চলিয়া যাইবেন বলিয়া, রাণী গোলাপ কুমারীর অনুমতি চাহিলেন। বুদ্ধিমতী রাণী গোলাপ কুমারী তাহাকে কাশী পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"বাছা, ভগবান পার্ব্বতী নাথের ইচ্ছা হইলে, এখানেই তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কাশী পরমপবিত্র স্থান। চিরকাল এখানে সাধু মহর্ষিদিগের সমাগম হইতেছে। তোমার পিতা কোথায় আছেন, এবং জীবিত আছেন কিনা, তাহাও কিছু নিশ্চয় জানিতে পার নাই। এ অবস্থায় তুমি কোথায় যাইয়া অনুসন্ধান করিবে? বরং ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া এখানেই অবস্থান কর।"

অমরসিংহ গোলাপ কুমারীর উপদেশানুসারে কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিল।

উল্লঙ্ঘন নামক প্রথম খণ্ড এই স্থানে সমাপ্ত হইল। প্রায়শ্চিত্ত নামক দ্বিতীয় খণ্ডে—পুরাতন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশীয় যে সকল লোকের সাহায্যে ভারতে রাজ্য বিস্তার করিলেন, তাহাদিগের উপকারের যেরূপ প্রতিদান করিয়াছিলেন;—দেশীয় রাজা এবং নবাবগণ আপন আপন প্রতিবেশীর রাজ্য অপহরণার্থ ইংরাজের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, চরমে যে গতি লাভ করিলেন;—নিরপরাধিনী, নির্ম্মল হৃদয়া হাফেজনন্দিনীর শোণিতের নিমিত্ত নবাব সুজাউদ্দৌলাকে, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকে, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সমুদয় অযোধ্যাবাসিদিগকে যেরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল;—এই পবিত্র হৃদয়া যুবতীর শোণিতসম্ভূত অনল সমগ্র অযোধ্যা যেরূপে ভস্মীভূত করিল;—চৈৎসিংহ অসৎ লোকের কুপরামর্শে লক্ষ্মীস্বরূপা আপন বিমাতা মহারাণী গোলাপ কুমারীকে গৃহ বহিষ্কৃতা করিয়া, যেরূপে রাজ্যনাশের বীজ বপন করিলেন;—অমরসিংহ পরোপকারার্থ জীবন বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইয়া, যেরূপে পুরস্কৃত হইলেন;—তৎসমুদই বিবৃত হইবে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।